রিক্তের বেদন

নিবেদন

রণকোলাহলের মত্ততার মাঝে জন্মেছিল তরুণ কবির ভাবরাজ্যের দ্যোতনা-ভরা এই উদ্ভাস। মেসোপটেমিয়ার ধূলি ঝেড়ে আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকেই একে কোল দিতে হয়েছিল। আমার অযোগ্যতাই এতদিন কবির হৃদয়োচ্ছ্বাসকে চেপে রেখে সহৃদয় পাঠকবর্গের সহিত তার পরিচয়ের ব্যাঘাত জন্মিয়েছে। এতে কবি ও তাঁর পাঠকবর্গের প্রতি অন্যায়-অত্যাচারের জন্য আমি দায়ী। অদ্য প্রায়শ্চিত্ত করলাম।

কলিকাতা
বড় দিন ১৯২৪

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

রিক্তের বেদন

[ক]

বীরভূম

আঃ ! এ কি অভাবনীয় নতুন দৃশ্য দেখলুম আজ ? ...

জননী জন্মভূমির মঙ্গলের জন্যে সে-কোন অদেখা-দেশের আগুনে প্রাণ আহুতি দিতে একি অগাধ-অসীম উৎসাহ নিয়ে ছুটেছে তরুণ বাঙালিরা,—আমার ভাইরা ! খাকি পোশাকের ম্লান আবরণে এ কোন আগুনভরা প্রাণ চাপা রয়েছে !—তাদের গলায় লাখো হাজার ফুলের মালা দোল খাচ্ছে, ওগুলো আমাদের মায়ের-দেওয়া ভাবী-বিজয়ের আশিস-মাল্য,—বোনের দেওয়া স্নেহ-বিজড়িত অশ্রুর গৌরবোজ্জ্বল-কণ্ঠহার !

ফুলগুলো কত আর্দ্র-সমুজ্জ্বল ! কি বেদনা-রাঙা মধুর ! ওগুলো তো ফুল নয়, ও যে আমাদের মা-ভাই-বোনের হৃদয়ের পূততম প্রদেশ হতে উজাড়-করে-দেওয়া অশ্রুবিন্দু ! এই যে অশ্রু ঝড়েছে আমাদের নয়ন গলে, এর মতো শ্রেষ্ঠ অশ্রু আর ঝরেনি,—ওঃ সে কত যুগ হতে !

আজ ক্ষান্ত-বর্ষণ প্রভাতের অরুণ কিরণ চিরে নিমিষের জন্যে বৃষ্টি নেমে তাদের খাকি বসনগুলোকে আরো গাঢ়-ম্লান করে দিয়েছিল। বৃষ্টির ঐ খুব মোটা ফোঁটাগুলো বোধ হয় আর কারুর ঝরা অশ্রু ! সেগুলো মায়ের অশ্রু-ভরা শান্ত আশীর্বাদের মতো তাদিগে কেমন অভিষিক্ত করে দিল !

তারা চলে গেল ! একটা যুগবাঞ্ছিত গৌরবের সার্থকতার রুদ্ধবক্ষ বাষ্পরথের বাষ্পরুদ্ধ ফোঁস ফোঁস শব্দ ছাপিয়ে আশার সে কি করুণ গান দুলে দুলে ভেসে আসছিল—

> 'বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটিরবাসী,
> হেরিব বিরহ-বিধুর-অধরে মিলন-মধুর হাসি,
> শুনিব বিরহ নীরব কণ্ঠে মিলন-মুখর বাণী,—
> আমার কুটির-রানি সে যে গো আমার হৃদয়-রানি।'

সমস্ত প্রকৃতি তখন একটা বুকভরা স্নিগ্ধতায় ভরে উঠেছিল ! বাংলার আকাশে, বাংলার বাতাসে সে বিদায়-ক্ষণে ত্যাগের ভাস্বর অরুণিমা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছিল। কে বলে মাটির মায়ের প্রাণ নেই ?

এই যে জল-ছলছল শ্যামোজ্জ্বল বিদায়-ক্ষণটুকু অতীত হয়ে গেল, কে জানে সে আবার কত যুগ বাদে এমনি একটা সত্যিকার বিদায়-মুহূর্ত আসবে?

আমরা 'ইস্তকনাগাদ' ত্যাগের মহিমা কীর্তন পঞ্চমুখে করে আসছি, কিন্তু কাজে কতটুকু করতে পেরেছি? আমাদের করার সমস্ত শক্তি বোধ হয় এই বলার মধ্য দিয়েই গলে যায়!

পারবে? বাংলার সাহসী যুবক! পারবে এমনি করে তোমাদের সবুজ, কাঁচা, তরুণ জীবনগুলো জ্বলন্ত আগুনে আহুতি দিতে, দেশের এতটুকু সুনামের জন্যে? তবে এস! 'এস নবীন, এস! এস কাঁচা, এস!' তোমরাই তো আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আশা, ভরসা, সব! বৃদ্ধদের মানা শুনো না। তাঁরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে সুনাম কিনবার জন্যে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে তোমাদের উদ্বুদ্ধ করেন, আবার কোনো মুগ্ধ যুবক নিজকে ঐ রকম বলিদান দিতে আসলে আড়ালে গিয়ে হাসেন এবং পরোক্ষে অভিসম্পাৎ করেন! মনে করেন, 'এই মাথা-গরম' ছোকরাগুলো কি নির্বোধ।' ভেঙে ফেলো ভাই, এদের এ সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-বন্ধন!

অনেকদিন পরে দেশে একটা প্রতিধ্বনি উঠছে, 'জাগো হিন্দুস্থান, জাগো! হুঁশিয়ার!'

নান্নুর

মা! মা! কেন বাধা দিচ্ছ? কেন এ-অবশ্যম্ভাবী একটা অগ্ন্যুৎপাতকে পাথর চাপা দিয়ে আটকাবার বৃথা চেষ্টা করছ?—আচ্ছা মা! তুমি বি-এ পাশ-করা ছেলের জননী হতে চাও, না বীর-মাতা হতে চাও? এ ঘুমের নিঝুম-আলস্যের দেশে বীরমাতা হবার মতো সৌভাগ্যবতী জননী কয়জন আছেন মা? তবে, কোনটি বরণীয় তা জেনেও কেন এ অন্ধস্নেহকে প্রশ্রয় দিচ্ছ? গরীয়সী মহিমান্বিত মা আমার! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—তোমার এ জনম-পাগল ছেলেকে ছেড়ে দাও! দুনিয়ার সব কিছু দিয়েও এখন আমায় ধরে রাখতে পারবে না। আগুন আমার ভাই—আমায় ডাক দিয়েছে! সে যে কিছুতেই আঁচল-চাপা থাকবে না। আর, যে থাকবে না, সে বাঁধন ছিঁড়বেই। সে সত্যসত্যই পাগল, তার জন্য এখনো এমন পাগলা-গারদের নির্মাণ হয়নি, যা তাকে আটকে রাখতে পারবে!

পাগল আজকে ভাঙরে আগল
পাগলা-গারদের

আর ওদের

সকল শিকল শিথিল করে বেরিয়ে পালা বাইরে
দুশমন স্বজনের মতো দিন-দুনিয়ায় নাইরে!
ও তুই বেরিয়ে পালা বাইরে!

* * *

আজ যুদ্ধে যাবার আদেশ পেয়েছি ! ... পাখি যখন শিকলি কাটে তখন তার আনন্দটা কি রকম বেদনা-বিজড়িত মধুর। ...

আহ, আমায় আদেশ দিয়ে শেষ আশিস করবার সময় মার গলার আওয়াজটা কি-রকম আর্দ্র-গভীর হয়ে গিয়েছিল ! সে কি উচ্ছ্বসিত রোদনের বেগ আমাদের দুজনকেই মুষড়ে দিচ্ছিল। ... হাজার হোক, মায়ের মন তো !

আকাশ যখন তার সঞ্চিত সমস্ত জমাট-নীর নিঃশেষে ঝরিয়ে দেয়, তখন তার অসীম নিস্তব্ধ বুকে সে কি একটা শান্তসজল স্নিগ্ধতার তরল কারুণ্য ফুটে ওঠে !

মার একমাত্র জীবিত সন্তান, বি-এ পড়ছিলুম ; মায়ের মনে যে কত আশাই না মুকুলিত পল্লবিত হয়ে উঠেছিল ! আমি আজ সে-সব কত নিষ্ঠুরভাবে দলে দিলুম ! কি করি, এদিনে এরকম যে না করেই পারি না।

আমার পরিচিত সমস্ত লোক মিলে আমায় তিরস্কার করতে আরম্ভ করেছে যেন আমি একটা ভয়ানক অন্যায় করেছি। সবাই বলছে, আমার সহায়-সম্বলহীন মাকে দেখবে কে ! ... হায়, আজ আমার মা যে রাজরাজেশ্বরীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা, তা কাউকে বোঝাতে পারব না !

কাকে বোঝাই যে, লক্ষপতি হয়ে দশ হাজার টাকা বিলিয়ে দিলে তাকে ত্যাগ বলে না, সে হচ্ছে দান। যে নিজকে সম্পূর্ণ রিক্ত করে নিজের সর্বস্বকে বিলিয়ে দিতে না পারলে, সে তো ত্যাগী নয়। মার এই উঁচু ত্যাগের গগনস্পর্শী চূড়া কেউ যে ছুঁতেই পারবে না। তাঁর এ গোপন বরেণ্য ত্যাগের মহিমা একা অন্তর্যামীই জানেন !

এই তো, সেই সত্যিকারের মোসলেম জননী, যিনি নিজ হাতে নিজের একমাত্র সন্তানকে যুদ্ধসাজে সাজিয়ে জন্মভূমির পায়ে রক্ত ঢালতে পাঠাতেন।

এ বিসর্জন, না অর্জন ?

সালার

জননী আর জন্মভূমির দিকে কখনো আর এত স্নেহ এত ব্যথিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখিনি, যেমন তাঁদিগে ছেড়ে আসবার দিনে দেখেছিলুম। ... শেষ চাওয়া মাত্রেই বোধ হয় এমনি প্রগাঢ় করুণ ! ...

নাঃ, আমাকে হয়রান করে ফেললে এদের অতিভক্তির চোটে। আমি যেন মহামহিমান্বিত এক সম্মানার্হ ব্যক্তিবিশেষ আর কি ! দিন নেই, রাত নেই, শুধু লোক আসছে আর আসছে। যে-আমাকে তারা এইখানেই হাজারবার দেখেছে তারাও আবার আমাকে নতুন করে দেখছে। এ যেন এক তাজ্জব ব্যাপার। আমি আমার চির-পরিচিত শৈশব-সাথী বন্ধুদের মাঝে থেকেও মনে করছি যেন 'আবু হোসেনে'র মতো এক রাত্তিরেই

আমি ঐরকম একটা রাজা-বাদশা গোছের কিছু হয়ে পড়েছি ! সবচেয়ে বেশি দুঃখ হচ্ছে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের ভক্তি দেখে। বন্ধুরা যদি ভক্তি করে, তাহ'লে বন্ধুদের ঘাড়ে পড়ল একটা প্রকাণ্ড মুদগর ! তাদিগে যতই বলছি, ভো ভো আহম্মকবৃন্দ, তোমাদের এ চোরের লক্ষণ, ওর্ফে অতিভক্তি সংবরণ কর, ততই যেন তারা আমার আরো মহত্ত্বের পরিচয় পাচ্ছে ! ... বাইরে তো বেরোনো দায় ! বেরোলেই অমনি স্ত্রী-পুরুষের ছোট বড় মাঝারি প্রাণী আমার দিকে প্রাণপথে চক্ষু বিস্ফারিত করে চেয়ে থাকে, আর অন্যকে আমার সবিশেষ ইতিবৃত্ত জ্ঞাত করিয়ে বলে, 'ঐ রে, ঐ লম্বা সুন্দর ছেলেটা যুদ্ধে যাচ্ছে।'

তারা কোনটা দেখে আমার,—ভিতর—না বাহির ?

[খ]

রেলপথে
(অল্ডালের কাছাকাছি)

যাক, এতক্ষণে লোকের ভক্তিশ্রদ্ধার আক্রমণ হতে রেহাই পাওয়া গেল !—উঃ, যুদ্ধের আগেই এও তো একটা মন্দ যুদ্ধ নয়, রীতিমতো দ্বন্দ্বযুদ্ধ ! এখন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। ...

একটা ভালো কাজ করে যা আনন্দ আর আত্মপ্রসাদ মনে মনে লাভ করা যায়, তার অনেকটা নষ্ট করে দেয় বাইরের প্রশংসায়।

সবচেয়ে বেশি ভিড় হয়েছিল কলকাতায় আর হাবড়ার স্টেশনে।—ওঃ, সে কি বিপুল জনতা আর সে কি আকুল আগ্রহ আমাদিগকে দেখবার জন্যে ! আমরা মঙ্গলগ্রহ হতে অথবা ঐ রকমের স্বর্গের কাছাকাছি কোনো একটা জায়গা হতে যেন নেমে আসছি আর কি ! যাঁদের সঙ্গে কখনো আলাপ করবারও সুযোগ পাইনি, তাঁরাও আমাদের সঙ্গে কোলাকুলি করেছেন আর অশ্রু গদগদ কণ্ঠে আশিস করেছেন—ঐ যে হাজার হাজার পুর-মহিলার হৃদয় গলে সহানুভূতির পূত অশ্রু ঝরছে, ওতেই আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল সূচিত হচ্ছে !—সকলেরই দৃষ্টি আজ কত স্নেহ-আর্দ্র কোমল ! ... ...

স্টেশনে স্টেশনে এই যে উপহারের আর বিদায়-সম্ভাষণের ধুমধাম, এতে কিন্তু বড্ডো বেশি ব্যতিব্যস্ত করে ফেলছে !—এসব রাজ্যের জিনিস খাবে কে ?—আহা, না, না, এই রকম উপহার দিয়েই যদি ওরা তৃপ্ত হয়, একটা অশ্রুময় গৌরবে বক্ষ ভ'রে ওঠে, তবে তাই হোক !

মন ! বুঝে নাও কি জন্যে এত ভক্তি-শ্রদ্ধা। ভেবে নাও কি ঘোর দায়িত্ব মাথায় করছ !

আমার কম্পিত বুকে থেকে থেকে এখনোও সেই আর্ত বন্দনার ঘন ঘন প্রতিধ্বনি হচ্ছে, 'বন্দে মাতরম—বন্দে মাতরম।'

রেলগাড়ি
নিশিভোর

কি সুন্দর জলে-ধোওয়া আকাশ! কি স্নিগ্ধ নিঝুম নিশি-ভোর! সারা প্রকৃতি এখনো তন্দ্রালস নয়নে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে রয়েছে। গোলাবি রঙের মসলিনের মতো খুব পাতলা একটা আবছায়া তার ধূমভরা ক্লান্ত দেহটায় জড়িয়ে রয়েছে। আর একটু পরেই এমন সুন্দর প্রকৃতি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে জেগে উঠবে, তার পরে সেই তেমনি নিত্যকার গোলমাল।

(ঐ, প্রত্যুষে)

এখন বোধ হচ্ছে যেন সমস্ত দেশটা এইমাত্র বিছানা ছেড়ে উঠে উদাস-অলস নয়নে তার চেয়েও উদার আকাশটার দিকে চেয়ে রয়েছে! এখনো তার আঁখির পাতায় পাতায় ঘুমের জড়িমা মাখানো! হাই তোলার মতো মাঝে মাঝে দমকা বাতাস ছুটে আসছে!

পাকা তবলচির মতো রেলগাড়িটা কি সুন্দর কার্ফা বাজিয়ে যাচ্ছে, 'পাঁঠা কেটে ভাগ দিন—পাঁঠা কেটে ভাগ দিন!' ইচ্ছে করছে রেল-চলার এই কার্ফা তালের তালে তালে একটা ভৈরোঁ কি টোড়ি রাগিণী ভাঁজি, কিন্তু গান গাইবার মতো এখন আদৌ সুর নেই যেন আমার কণ্ঠে।

মধুপুর

নিশিশেষের গ্যাসের আলো পড়ে আমাদের মুখগুলো কি করুণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। ঐ ফ্যাকাশে আলোর পাণ্ডুর আভা প্রতিভাত হয়ে আমার ঘুমন্ত সৈনিকবন্ধুর সিক্ত নয়ন-পল্লবগুলি কিরকম চকচক করছে! ও কিসের অশ্রুবিন্দু? বিদায়-ব্যথার?—কে জানে!...

আজ এই প্রভাতের গ্যাসের আলোর মতোই পাণ্ডুর রক্তহীন একটি তরুণ মুখ ক্ষণে ক্ষণে আমার বুকের মাঝে ভেসে উঠছে। এখন যেন একটা বাষ্পময় কুয়াশার মতো আধো-আলো আধো-আঁধার ভাব দেখা যাচ্ছে, কদিন ধরে তার দৃষ্টিটিও এই রকম ঝাপসা সজল হয়ে উঠেছিল! সে কিন্তু কখনো কিছু বলেনি—কিছু বলতে পারেনি—আমিও কখনো মুখ ফুটে কিছু বলতে পারিনি—হাজার চেষ্টাতেও না! কি যেন একটা লজ্জামিশ্রিত কিছু আমায় প্রাণপণে চোখমুখ ঢেকে মানা করত—না, না, না, তবু কি করে আমাদের দুটি প্রাণের গোপন কথা দুজনেই জেনেছিলুম।—ওঃ, প্রথম যৌবনের

এই গোপন ভালোবাসাবাসির মাধুর্য কত গাঢ়। আমার বিদায়দিনেও আমি একটি মুখের কথা বলতে পারিনি তাকে! শুধু একটা জমাট অশ্রুখণ্ড এসে আমার বাকরোধ করে দিয়েছিল! সেও কিছু বলেনি, যতদিন বাড়িতে ছিলুম, ততদিন শুধু লুকিয়ে কেঁদেছে আর কেঁদেছে! তারপর বিদায়ের ক্ষণে তাদের ভাঙা দেয়ালটা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রক্ত-ভরা আঁখিতে ব্যাকুল বেদনায় চেয়েছিল!—মা যেন আমার গোপন-ব্যথার রক্ত-ক্ষরা দেখেই সেদিন বলেছিলেন, 'যা বাপ, একবার শহিদাকে দেখা দিয়ে আয়। সে মেয়ে তো কেঁদে কেঁদে একেবারে নেতিয়ে পড়েছে!'—আমি তখন জোর করে বলেছিলুম, 'না মা, মরুকগে সে, আমি কিছুতেই দেখা করতে পারব না।'—হায়রে, খামখেয়ালির অহেতুক অভিমান!

আজ বড় দুঃখে আমার সেই প্রিয় গানটা মনে পড়ছে,—

'দুজনে দেখা হলো মধু-যামিনীরে—
কেন কথা কহিল না-চলিয়া গেল ধীরে?
নিকুঞ্জে দখিনাবায়, করিছে হায় হায়—
লতাপাতা দুলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে!—
দুজনের আঁখিবারি গোপনে গেল ঝরে—
দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল মরে;
আর তো হলো না দেখা জগতে দোঁহে একা,
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা-তীরে!—'

উঃ, কি পানসে উদাস আজকার ভোরের বাংলাটা!—সদ্যসুপ্তোত্থিত বনের বিহগের আনন্দ-কাকলি আজ যেন কিরকম অশ্রুজড়িত আর দীর্ণ ব্যথিত!

এই গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দটা কত অরুন্তুদ গভীর! ঠিক যেন গির্জায় কোনো অতীত হতভাগার চিরবিদায়ের শেষ ঘণ্টাধ্বনি।

লাহোরের অদূরে
(নিশীথ)

একটা বিরাট মহিষাসুরের মতো কি একরোখা ছুট ছুটছে এই উন্মাদ বাষ্প-রথটা! ... ছোটো, ওগো আগুন-আর-বাষ্প-পোরা দানব, ছোটো! আর দোল দাও—দোল দাও এই তরুণ তোমার ভাইদের! ছোটো, ওগো খ্যাপা দৈত্য, ছোটো—আর পিষে দিয়ে যাও তোমার এই লৌহময় পথটাকে! তোমার পথের পাশে ঘুমিয়ে যারা, তাদের জাগিয়ে দিয়ে যাও তোমার এই ছোটার শব্দে! ...

নিশীথের জমাট অন্ধকার চিরে শান্ত বনশ্রীকে চকিত শঙ্কিত করে কত জোরে ছুটেছে এই খামখেয়ালি মাথাপাগলা রাক্ষসটা,—কিন্তু তার চেয়েও লক্ষ গুণ বেগে আমার মন উল্টোদিকে ছুটেছে—যেখানে আমার সেই গোপন আকাঙ্ক্ষিতার বাষ্পরুদ্ধ চাপাকান্নার আকুলতা গ্রামের নিরীহ অন্ধকারকে ব্যথিত ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে! মন

আমার তারি সাথে শ্বাস ফেলছে, যে হতভাগিনীর ফুলে-ফুলে-ওঠা দীর্ঘশ্বাস সরল-মেঠো বাতাসটিকে নিষ্ঠুরভাবে আহত করছে! আলুথালু আকুলকেশ, ধূলি-লুণ্ঠিত শিথিল-বসন, উজাড় করে দেওয়া আঁসুয় ভেজা উপাধান,—সব যেন মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি আর এই মধু-কল্পনার স্নিগ্ধকারুণ্য আমার বুকে কেমন একটি গৌরবের ছোঁয়া দিয়ে যাচ্ছে!

সমস্ত শাল আর পিয়াল বন কাঁপিয়ে যেন একটা পুত্রশোকাতুরা দৈত্য-জননী ডুকরে ডুকরে কাঁদছে 'ঔ—ঔ—ঔ!' আর মাতৃহারা দৈত্যশিশুর মতো এই খ্যাপা গাড়িটাও এপার থেকে কাৎরে' কাৎরে' উঠছে, উ—উ—উঃ!

[গ]

নৌশেরা

এস আমার বোবা সাথী, এস! আজ কতদিন পরে তোমায় আমায় দেখা! তোমার বুকে এমনি করে আমার প্রাণের বোঝা নামিয়ে না রাখতে পারলে এতদিন আমার ঘাড় দুমড়ে পড়ত!

আহ্ কি জ্বালা! এত হাড়ভাঙা পরিশ্রম, এত গাধাখাটুনির মাঝেও সেই একান্ত অন্ধস্মৃতিটার ব্যথা যেন বুকের উপর চেপে বসে আছে! ... আজ তাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে! হৃদয়, শক্ত হও—বাঁধন ছিঁড়তে হবে। যে তোমার কখনো হয়নি, যাকে ককখনো পাও নি, যে তোমার হয়তো ককখনো হবে না, যাকে ককখনো পাবে না, যার অজানা ভালোবাসার স্মৃতিটাই ছিল—তোমার সারা বক্ষ বেদনায় ভরে, সেই শহিদার স্মৃতিটাকেও ধুয়ে মুছে ফেলতে হবে! উঃ! তা ... পারবে? সাহস আছে? 'না বললে চলবে না, এ যে পারতেই হবে! মনে পড়ে কি আমাদের দেশের মা-ভাই-বোনের দেওয়া উপহার? বুঝেছিলে কি যে, ওগুলি তাঁদের দেওয়া দায়িত্বের, কর্তব্যের গুরুভার? আমাদের কাজের উপর আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কষ্টিপাথরের মতো সহ্যগুণ আমাদের থাকা চাই, তবে না জগতের লোকে যাচাই করে নেবে যে, বাঙালিরাও বীরের জাতি। এ সময় একটা গোপন স্মৃতি-ব্যথা বুকে পুষে মুষড়ে পড়লে চলবে না। তাকে চাপা দিতেও পারবে না, নিঃশেষে বিসর্জন দিতে হবে! একেবারে বাইরের ভিতরের সব কিছু উজাড় করে বিলিয়ে দিতে হবে, তবে না রিক্ততার—বিজয়ের পূর্ণরূপ ফুটে উঠবে প্রাণে! অনেকে জীবন দিয়েছে, তবু এই প্রাণপণে-আঁকড়ে ধরে থাকা মধু-স্মৃতিটুকু বিসর্জন দিতে পারেনি! তোমাকে সেই অসাধ্য সাধন করতে হবে! পারবে? সাধনার সে জোর আছে?—যদি না পারো তবে কেন নিজেকে 'মুক্ত', 'রিক্ত', 'বীর' বলে চেঁচিয়ে আকাশ ফাটাচ্ছ? যার প্রাণের গোপনতলে এখনো কামনা জেগে রয়েছে, সে ভোগী-মিথ্যুক আবার ত্যাগের দাবি করে কোন লজ্জায়? সে কাপুরুষের

আবার বীরের পবিত্র শিরস্ত্রাণের অবমাননা করবার কি অধিকার আছে? দেশের জন্য প্রাণ দিবে যারা, তারা প্রথমে হবে ব্রহ্মচারী, ইন্দ্রিয়জিৎ!—

মাথার ওপর মা আমার ভাবী-বিজয়ী বীর-সন্তানের মুখের দিকে আশা-উৎসুক নয়নে চেয়ে রয়েছেন, আর পায়ের নিচে এক তরুণী তার অশ্রুমিনতি-ভরা ভাষায় সাধছে, 'যেয়ো না গো প্রিয়, যেয়ো না।' কি করবে? ... নিশ্চয়ই পারবে! তুমি যে মায়ামমতাহীন কঠোর সৈনিক! ...

শক্ত হও হৃদয় আমার, শক্ত হও! আজ তোমার বিসর্জনের দিন! আজ ঐ কাবুল নদীর ধারের উষর প্রান্তরটার মতোই বুকটাকে রিক্ত শূন্য করে ফেলতে হবে। তবে না তোমার সমস্ত তৃষ্ণা, সমস্ত সুখ-দুঃখ বৈরাগ্যের যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিতে পূর্ণ রিক্ততার গান ধরবে,—

'ওগো কাঙাল, আমায় কাঙাল করেছ
আরো কি তোমার চাই?
ওগো ভিখারি, আমার ভিখারি,—
পলকে সকলি সঁপেছি চরণে আর তো কিছুই নাই।—
আরো কি তোমার চাই'

* * *

কুর্দিস্তান

পেয়েছি,—পেয়েছি! ওঃ, আজ দীর্ঘ এক বৎসর পরে আমার প্রাণ কেন পূর্ণ-রিক্ততায় ভরে উঠেছে বলে বোধ হচ্ছে! ... এই এক বৎসর ধরে সে কি ভয়ানক যুদ্ধ মনের সাথে! এ সমরে কত কিছুই না মারা গেল! ... বাইরের যুদ্ধের চেয়ে ভিতরের যুদ্ধ কত দুরন্ত দুর্বার! রণজিৎ অনেকেই হতে পারে, কিন্তু মনজিৎ কজন হয়?—সে কেমন একটা প্রদীপ্ত কাঠিন্য আমাকে ক্রমেই ছেয়ে ফেলছে। সে কি সীমাহীন বিরাট শূন্য হয়ে গেছে হৃদয়টা আমার!—এই কি রিক্ততা? ... ভোগও নেই—ত্যাগও নেই; তৃষ্ণাও নেই—তৃপ্তিও নেই; প্রেমও নেই—বিচ্ছেদও নেই;— এ যেন কেমন একটা নির্বিকার ভাব! না ভাই, না, এমন রিক্ততা-ভরা তিক্ততা দিয়ে জীবন শুধু দুর্বিষহই হয়ে পড়ে! এমন কঠিন অকরুণ মুক্তি তো আমি চাইনি! এ যেন প্রাণহীন মর্মর-মন্দির! ...

তবু কিন্তু রয়ে রয়ে মর্মরের শক্ত বুকে শুক্লা চাঁদিনির মতো করুণ মধুর হয়ে সে কার স্নিগ্ধশান্ত আলো হৃদয় ছুঁয়ে যায়?—হায়, ছুঁয়ে যায় বটে, কিন্তু আর তো তেমন নুয়ে যায় না! ... দেখেছ? আমার অহঙ্কারী মন তবু বলতে চায় যে, ওটি নিজেকে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দেওয়ার একটা অখণ্ড আনন্দের এক কণা শুভ্র জ্যোতি!—তবু সে বলবে না যে ওটা একটি বিসর্জিতা প্রতিমার প্রীতির কিরণ! ...

আঃ, আজ এই আরবের উলঙ্গ প্রকৃতির বুকে-মুখে মেঘমুক্ত শুভ্রজ্যোৎস্না পড়ে তাকে এক শুক্লবসনা সন্ন্যাসিনীর মতো দেখাচ্ছে! এদেশের এই জ্যোৎস্না এক উপভোগ

করবার জিনিস। পৃথিবীর আর কোথাও বুঝি জ্যোৎস্না এত তীব্র আর প্রখর নয়। জ্যোৎস্নারাত্রিতে তোলা আমার ফটোগুলো দেখে কেউ বিশ্বাস করবে না যে এগুলো জ্যোৎস্নালোকে তোলা ফটো। ঠিক যেন শরৎপ্রভাতের সোনালি রোদ্দুর।

হাঁ,—এতে মস্ত আর এক মুশকিলে পড়লুম দেখছি। ... ডালিম ফুলের মতোই সুন্দর রাঙা টুকটুকে একটি বেদুঈন যুবতী পাকড়ে বসেছে যে, তাকে বিয়ে করতেই হবে। সে কি ভয়ানক জোর-জবরদস্তি! আমি যত বলছি 'না', সে তত একরোখা ঝোঁকে বলে, 'হাঁ, নিশ্চয়ই হাঁ!' সে বলছে যে, সে আমাকে বড্ডো ভালোবেসে ফেলেছে, আমি বলছি যে, আমি তাকে একদম ভালোবাসিনি। সে বলছে, তাতে কিছু আসে যায় না,—আমাকে ভালোবেসেছে, আমাকেই তার জীবনের চিরসাথী বলে চিনে নিয়েছে—ব্যস! এই যথেষ্ট! আমার ওজর-আপত্তির মানেই বোঝে না সে! আমি যতই তাকে মিনতি করে বারণ করি, সে ততই হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে বলে, 'বাঃ-রে, আমি যে ভালোবেসেছি, তা তুমি বাসবে না কেন?'—হায়, একি জুলুম।

ওরে মুক্ত! ওরে রিক্ত! তোর ভয় নেই, ভয় নেই! এই যে হৃদয়টাকে শুষ্ক করে ফেলেছিস, হাজার বছরের বৃষ্টিপাতেও এতে ঘাস জন্মাবে না, ফুল ফুটবে না! এ বালি-ভরা নীরস সাহারায় ভালোবাসা নেই।

যে ভালোবাসবে না, তাকে ভালোবাসায় কে? যে বাধা দেবে না, তাকে বাঁধে কে?—'আমাকে যে বাঁধবে ধরে, এই হবে যার সাধন, সে কি অমনি হবে? ...'

কারবালা

এই সেই বিয়োগান্ত নিষ্করুণ নাটকের রঙ্গমঞ্চ,—যার নামে জগতের সারা মোসলেম নরনারীর আঁখি-পল্লব বড় বেদনায় সিক্ত হয়ে ওঠে! এখানে এসেই মনে পড়ে সেই হাজার বছর আগের ধর্ম আর দেশ রক্ষার জন্যে লক্ষ লক্ষ তরুণ বীরের হাসতে হাসতে 'শহীদ' হওয়ার কথা! তেমনি বয়ে যাচ্ছে সেই ফোরাত নদী, যার একবিন্দু জলের জন্য দুধের ছেলে, 'আসগর' কচি বুকে জহর-মাখা তীরের আঘাত খেয়ে বাবার কোলে তৃষ্ণার্ত চোখ দুটি চিরতরে মুদেছিল! ফোরাতের এই মরুময় কূলে কূলে না জানি সে কত পবিত্র বীরের খুন বালির সঙ্গে মাখানো রয়েছে। আঃ, এ বালির পরশেও যেন আমার অন্তর পবিত্র হয়ে গেল।

কয়েকটা পাষাণময় নিস্তব্ধ গৃহ খাড়া রয়েছে জমাট হয়ে,—উদার অসীম আকাশেরই মতো বিব্রত মরুভূমি তার বালুভরা আঁচল পেতে চলেই গিয়েছে,—ছোট্ট দুটি তৃষ্ণাতুর দুম্বা-শিশু 'মা 'মা করে চিৎকার করতে করতে ফোরাতের দিকে ছুটে আসছে,—শিশির-বিন্দুর মতো সুন্দর কয়েকটি বুভুক্ষু বালিকা ফোরাতের এক হাঁটু জলে নেমে আঁজলা আঁজলা জল পান করে ক্ষুণ্নিবৃত্তির চেষ্টা করছে—বালিতে আর বাতাসে মাতামাতি,—এইসব মিলে কারবালার একটি করুণ চিত্র চোখের সামনে ফুটে উঠছে।

কারবালা ! কারবালা ! আজ তোমারই আকাশ, তোমারই বাতাস, তোমারই বক্ষের মতো আমার আকাশ বাতাস বক্ষ সব একটা বিপুল রিক্ততায় পূর্ণ ! ...

সেদিনও সেই বেদুইন যুবতীগুলোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।—এই অবাধ্য অবুঝ তরুণী সে কি উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল আমার পিছু পিছু ছুটছে। আমি বাইরে বেরোলেই দেখতে পাই, সে একটা মস্ত আরবি ঘোড়ায় চড়ে ফোরাতের কিনারে কিনারে আরবি গজল গেয়ে বেড়াচ্ছে ! সে সুরের গিটকারি কত তীব্র—কি তীক্ষ্ণ। প্রাণে যেন খেদং তীরের মতো এসে বিঁধে !

আমি বললুম, 'ছিঃ গুল, একি পাগলামি করছ ?—আমার প্রাণে যে ভালোবাসাই নেই, তা ভালোবাসব কি করে ?' সে তো হেসেই অস্থির। মানুষের প্রাণে যে ভালোবাসা নেই, তা সে নতুন শুনলে।—আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আমায় ভালোবাসবার তোমার তো কোনো অধিকার নেই গুল !'—সে আমার হাতটা তার কচি কিশলয়ের মতো কম্পিত ওষ্ঠপুটে ছুঁইয়ে আর মুখটা পাকা বেদানার চেয়েও লাল করে বললে, 'অধিকার না থাকলে আমি ভালোবাসছি কি করে হাসিন ?'—এ সরল যুক্তির পরে কি আর কোনো কথা খাটে ?

[ঘ]

আজিজিয়া

কি মুশকিল ! কোথায় কারবালা আর কোথায় আজিজিয়া ! আর সে কতদিন পরেই না এখানে এসেছি ! ... তবু গুল এখানে এল কি করে ?

শুনছি এদেশের সুন্দরীরা এমনি মুক্ত স্বাধীন আবার এমনি একগুঁয়ে। একবার যাকে ভালোবাসে, তাঁকে আর চিরজীবনেও ভোলে না। এদের এ সত্যিকারের ভালোবাসা। এ উদ্দাম ভালোবাসায় মিথ্যা নেই, প্রতারণা নেই !—কিন্তু আমি তো এ 'সাপে-নেঙুড়ে' ভালোবাসায় বিলকুল রাজি নই। তা হলে আমার এ রিক্ততার অহঙ্কারের মাথা কাটা যাবে যে। ...

কাল যখন গুল আমার পাশ দিয়ে ঘোড়াটা ছুটিয়ে চলে গেল, তখন তার 'নরগেস' ফুলের মতো টানা চোখ দুটোয় কি একটা ব্যথা-কাতর মিনতি কেঁপে কেঁপে উঠছিল ! তার সেই চকিত চাওয়ার মৌনভাষা যেন কেঁদে কেঁদে কয়ে গেল, 'বহুৎ দাগা দিয়া তু বেরহম !' ...

আমি আবার বললুম, 'আমি যে মুক্ত, আমায় বাঁধতে পারবে না ! ... আমি যে রিক্ত, আমি তোমায় কি দিব ?' সে তা'র ফিরোজা রঙের উড়ানিটা দিয়ে আমার হাতদুটো এক নিমেষে বেঁধে ফেলে বললে, 'এই তো বেঁধেছি ! ... আর তুমি রিক্ত বলছ

হাসিন? তা হোক, আমার কুম্ভ-ভরা ভালোবাসা হতে না হয় খানিক ঢেলে দিয়ে তোমার রিক্ত চিত্ত পূর্ণ করে দেবো!'

আমি যত বলছি, 'না—না', সে তত হাসছে আর বলছে, 'মিথ্যুক, মিথ্যুক, বেরহম!'

সত্যিই তো, একি নতুন উন্মাদনা জাগিয়ে দিচ্ছ প্রাণে গুল? কেন আমার শুষ্ক প্রাণকে মুঞ্জরিত করে তুলছ—নাঃ, এখান হতেও সরে পড়তে হবে দেখছি।—আমার কি একটা কথা মনে পড়ছে, 'সকল গরব হায়, নিমেষে টুটে যায়, সলিল বয়ে যায় নয়নে।'

ওরে আকাশের মুক্ত পাখি, ওরে মুগ্ধ বিহগী! একি শিকলি পরতে চাচ্ছিস তা তুই এখন কিছুতেই বুঝতে পারছিসনে।—এড়িয়ে চল—এড়িয়ে চল সোনার শিকল!... 'মানুষ মরে মিঠাতে, পাখি মরে আঠাতে!'

* * *

কুতল-আমারা
(শেষ বসন্তের নিশীথ রাত্রি)

আঃ, খোদা! কেমন করে তুমি এমন দু দুটো আসন্ন বন্ধন হতে আমায় মুক্তি দিলে, তাই ভাবছি আর অবিশ্রান্ত অশ্রু এসে আমাকে বিচলিত করে তুলছে! এ মুক্তির আনন্দটা বড় নিবিড় বেদনায় ভরা! রিক্তের বেদন আমার মতো এমনি বাঁধা আর ছাড়ার দুটানার মধ্যে না পড়লে কেউ বুঝতে পারবে না ... হাঁ, এই সঙ্গে একটা নীরস হাসির বেগ কিছুতেই যেন সামলাতে পারছিনে এই দুটো ব্যর্থ-বন্ধনের নিষ্ঠুর কঠিন পরিণাম দেখে। তাই এই নিশীথে একটা পৈশাচিক হাসি হেসে গাইছি, 'নিঠুর, এই করেছ ভালো! এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দাহন জ্বালো! এই করেছ ভালো!' কি হয়েছে, তাই বলছি!—

সেদিন চিঠি পেলুম, শহিদার, আমার গোপন ঈপ্সিতার বিয়ে হয়ে গেছে,—সে সুখী হয়েছে!... মনে হলো, যেন এক বন্ধন হতে মুক্তি পেলাম।—না, না, আর অসত্য বলব না, আমার সেই সময় কেমন একটা হিংসা আর অভিমানে সারা বুক যেন আলোড়িত হয়ে উঠেছিল, তাই এই কদিন ধরে বড় হিংস্রের মতোই ছুটে বেড়িয়েছি, কিন্তু শান্তি পাইনি। এই আমাদের রক্তমাংসময় শরীর আর তারই ভিতরকার মনটা নিয়ে যতটা অহঙ্কার করি, বাইরে তার কতটুকু টিকে?—যেমনি মনটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে এক নিমেষের জন্য দুরস্ত করে রাখি, অমনি মনে হয় 'এই তো এক মস্ত দরবেশ হয়ে পড়েছি।' তারপরই আবার কখন কোন ক্ষণে যে মনের মাঝে ক্ষুধিত বাসনা হাহাকার ক্রন্দন জুড়ে দেয়, তা আর ভেবেই পাই না! আবার, পেলেও সেটা মিথ্যা দিয়ে

ঢাকতে চাই!—হায়রে মানুষ! বুঝি বা এই বন্ধনেই সত্যিকার মুক্তি রয়েছে! কে জানে? ... ভুলে যাও অভাগিনী শহিদা, ভুলে যাও—সকল অতীত, সব স্মৃতির বেদনা, সব গোপন আকাঙ্ক্ষা, সব কিছু। সমাজের চারিদিকে অন্ধকার খাঁচায় বন্দিনী থেকে কেন হতভাগিনী তোমরা এমন করে অ-পাওয়াকে পেতে চাও? কেন তোমাদের মুগ্ধ অবোধ হিয়া এমন করে তারই পায়ে সব ঢেলে দেয়, যাকে সে কখখনো পাবে না? তবে কেন এ অন্ধ কামনা? ... বিশ্বের গোপনতম অন্তরে অন্তরে তোমাদের এই ব্যর্থপ্রেমের বেদনা-ধারা ফল্গুনদীর মতো বয়ে যাচ্ছে, প্রাণপণে এই মূঢ় ভালোবাসাকে রুখতে গিয়ে তোমার হৃদয় ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে আর সেই বিদীর্ণ হৃদয়ের খুনে সমাজের আবরণ লালে-লাল হয়ে গেছে, তবু সে তোমাদের এই আপনি-ভালোবাসার, পূর্বরাগের প্রশ্রয় দেয়নি। তাই আজো পাথরের দেবতার মতো বিশাল দণ্ডহস্তে সে তোমাদের সতর্ক পাহারা দিচ্ছে!

ভুলে যাও শহিদা, ভুলে যাও, নতুনের আনন্দে পুরাতন ভুলে যাও! তোমাদের কোনো ব্যক্তিত্বকে ভালোবাসবার অধিকার নেই, জোর করে স্বামীত্বকে ভালোবাসতে হবেই! ...

আঃ, আজ কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের চাঁদের ম্লান রশ্মি পাতলা মেঘের বসন ছিঁড়ে কি মলিন করুণ হয়ে ঝরছে!—গত নিশির কথাটা মনে পড়ছে আর গুরুব্যথায় নিজেই কেঁপে কেঁপে উঠছি!—

কাল রাত্তিরে এমনি সময়ে যখন এখানকার সান্ত্রীদের অধিনায়করূপে রিভলভার-হাতে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করে বেড়াচ্ছি, তখন শুনলুম, পেছনের সান্ত্রী একবার গুরুগম্ভীর আওয়াজে 'চ্যালেঞ্জ' করলে, 'হল্ট, হু কামস দেয়ার?' আর একবার সে জোরে বললে, 'কৌন হেয়? খাড়া রহো! হিলো মৎ!—মাগো!—উঃ!' তারপর আর কোনো আওয়াজ পাওয়া গেল না। শুধু একটা অব্যক্ত গোঙানি হাওয়ায় ভেসে এল! আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে দেখলুম, লাল পোশাক-পরা একটি আরব রমণী সান্ত্রীর রাইফেলটা নিয়ে ছুটছে আর সান্ত্রীর হিমদেহ নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রয়েছে। আমার আর বুঝতে বাকি থাকল না কেন এতদিন ধরে আমাদের রাইফেল চুরি যাচ্ছে আর সান্ত্রী মারা পড়ছে! ওঃ কি দুর্ধর্ষ-সাহসী এই বেদুইন রমণীরা! আমি পলকে স্থির হয়ে রমণীকে লক্ষ্য করে গুলি ছাড়লুম, তার গায়ে লাগল না। আর একটা গুলি ছাড়তেই বোধ হয় নিজের বিপদ ভেবেই সে সহসা আমার দিকে মুখ ফিরে দাঁড়াল, তারপর বিদ্যুদ্বেগে পাকা সিপাইয়ের মতো রাইফেলটা কাঁধে করে নিয়ে আমার দিকে লক্ষ্য করল; খট করে বোল্ট বন্ধ করার শব্দ হল, তারপর কি জানি-কেন হঠাৎ সে রাইফেলটা দূরে ছুড়ে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল!—আত্মরক্ষার্থে আমি ততক্ষণ 'বোল্ট' বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিলুম। এই সুযোগে এক লাফে রিভলভারটা

নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেই যা দেখলুম, তাতে আমারও হাতের রিভলভারটা এক পলকে খসে পড়ল।—তখন তার মুখের বোরকা খসে পড়েছে আর মেঘ ছিঁড়ে পূর্ণিমা-শশীর পূর্ণ শ্বেত জোছনা তার চোখে মুখে যেন নিঃশেষিত হয়ে পড়েছে! আমি স্পষ্ট দেখলুম, জানু পেতে বসে বেদুইন যুবতী গুল। তার বিস্ময়চকিত চাউনি ছাপিয়ে জ্যোৎস্নার চেয়েও উজ্জ্বল অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে। একটা বেদনাতুর আনন্দের আতিশয্যে সে থরথর করে কাঁপছিল। তার প্রাণের ভাষা তারই ঐ অশ্রুর আখরে যেন আঁকা যাচ্ছিল, 'এতদিনে এমন করে দেখা দিলে নিষ্ঠুর! ছি, এত কাঁদানো কি ভালো!' পাথর কেটে সে কে যেন আমার চোখে অনেকদিন পরে দুফোঁটা অশ্রু এনে দিল!

এ কি পরীক্ষায় ফেললে খোদা? আমার এ বিস্ময়মুগ্ধ ভাব কেটে যাবার পরেই মনে হলো, কি করা উচিত? ভয় হল আজ বুঝি সব সংযম, সব ত্যাগ-সাধনা এই মুগ্ধা তরুণীর চোখের জলে ভেসে যায়!—আবার এই সঙ্গে মনে পড়ল শহিদার কথা, এমনি একটি কচি অশ্রুস্নাত মুখ!...

সমস্ত কুতল-আমারার মরুভূমি আর পাহাড়ের বুকে দোল খাইয়ে কার জলদমন্দ্র আওয়াজ ছুটে এল, '...সেনানী—হুঁশিয়ার!'

আবার আমি যেমন দেখতে পেলুম, আশিস-বারির মঙ্গলঝারি আর অশ্রুসমুজ্জ্বল বিজয়মালা হস্তে বাংলা আমাদের দিকে আশা-উত্তেজিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে!—প্রেমের চরণে কর্তব্যের বলিদান দেবো? না, না, ককখনো না!

আপনা-আপনি আমার কঠিন মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'খোদা, হৃদয়ে বল দাও! বাহুতে শক্তি দাও! আর কর্তব্য-বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করো প্রাণের শিরায় শিরায়!'...

নিমেষে আমার সমস্ত রক্ত উষ্ণ হয়ে ভীমতেজে নেচে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে বজ্রমুষ্টিতে পিস্তলটা সোজা করে ধরলুম! সমস্ত স্তব্ধ প্রকৃতির বুকে বাজ পড়ার মতো কড় কড় করে কার হুকুম এল, 'গুলি করো!'...

দ্রুম! দ্রুম!! দ্রুম!!!... একটা যন্ত্রণা-কাতর কাৎরানি—আম্মা!—মাঃ!! আঃ!!...

তারপরেই সব শেষ।

* * *

তারপরেই আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লুম!... ছুটে গিয়ে গুলের এলিয়ে-পড়া দেহলতা আমার চিরতৃষিত অতৃপ্ত বুকে বিপুল বলে চেপে ধরলুম! তারপর তার বেদনাস্ফুরিত ওষ্ঠপুটে আমার পিপাসী ওষ্ঠ নিবিড়ভাবে সংলগ্ন করে আর্তকণ্ঠে ডাকলুম, 'গুল—গুল—গুল!' প্রবল একটা জলো-হাওয়ার নাড়া পেয়ে শিউলি ঝরে পড়ার মতো শুধু একরাশ ঝরা অশ্রু তার আমার মুখে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল!

অবশ অলস তার ভূজলতা দিয়ে বড় কষ্টে সে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরলে, তারপর আরো কাছে—আরো কাছে সংলগ্ন হয়ে নিসাড় নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল ! ... মেঘের কোলে লুকিয়ে-পড়া চাঁদের পানসে জ্যোৎস্না তার ব্যথা-কাতর মুখে পড়ে সে কি একটা স্নিগ্ধ করুণ মহিমশ্রী ফুটিয়ে তুলেছিল ! ... সেই অকরুণ স্মৃতিটাই বুঝি আমার ভাবী জীবনের সম্বল, বাকি পথের পাথেয় ! ... অনেকক্ষণ পরে সে আস্তে চোখ খুলে আমার মুখের পানে চেয়েই চোখ বুজে বললে, 'এই 'আশেকের' হাতে 'মাশুকের' মরণ বড় বাঞ্ছনীয় আর মধুর, নয় হাসিন ?' আমি শুধু পাথরের মতো বসে রইলুম। আর তার মুখে এক টুকরা মলিন হাসি কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে গেল ! শেষের সে তৃপ্ত হাসি তার ঠোঁটে আর ফুটল না, শুধু একটা ভূমিকম্পের মতো কিসের ব্যাকুল শিহরণ সঞ্চরণ করে গেল ! ... তার বুকের লোহুতে আর আমার আঁখের আঁসুতে এক হয়ে বয়ে যাচ্ছিল ! সে তখনো আমায় নিবিড় নিষ্পেষণে আঁকড়ে ধরে ছিল আর তার চোখে-মুখে চিরবাঞ্ছিত তৃপ্তির স্নিগ্ধ শান্তশ্রী ফুটে উঠেছিল !—এই কি সে চাচ্ছিল ? তবে এই কি তার নারী-জীবনের সার্থকতা ? ... আর একবার—আর একবার—তার মৃত্যুশীতল ওষ্ঠপুটে আমার শুষ্ক অধরোষ্ঠ প্রাণপণে নিষ্পেষিত করে হুমড়ি পড়ে ডাক দিলুম,—'গুল, গুল, গুল !' বাতাসে আহত একটা কঠোর বিদ্রূপ আমায় মুখ ভ্যাংচিয়ে গেল, 'ভুল—ভুল—ভুল !' ...

আবার সমস্ত মেঘ ছিন্ন করে চাঁদের আলোর যেন ফিং ফুটছিল। গুলের নিঝুম দেহটা সমেত আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ছিলুম, এমন সময় বিপুল ঝন্‌ঝার মতো এসে এক প্রৌঢ়া বেদুইন মহিলা আমার বক্ষ হতে গুলকে ছিনিয়ে নিলে এবং উন্মাদিনীর মতো ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, 'গুল—আম্মা—গুল !'

* * *

প্রৌঢ়া তার মৃতা কন্যাকে বুকে চেপে ধরে আর একবার আর্তনাদ করে উঠতেই আমি তার কোলে মূর্ছাতুরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ডাকলুম, 'আম্মা—আম্মা !' মার মতো গভীর স্নেহে আমার ললাট চুম্বন করে প্রৌঢ়া কেঁদে উঠল, 'ফরজন্দ, ফরজন্দ !' কাবেরীর জলপ্রপাতের চেয়েও উদ্দাম একটা অশ্রুস্রোত আমার মাথায় ঝরে পড়ল। ...

আঃ ! কত নিদারুণ সে কন্যাহীনা মার কান্না !

* * *

আমি আবার প্রাণপণে গা ঝেড়ে উঠে কাৎরে উঠলুম, 'আম্মা—আম্মা—মা !' —একটা রুদ্ধ কণ্ঠের চাপা কান্নার প্রতিধ্বনি পাগল হাওয়ায় বয়ে আনলে—'ফরজন্দ !'...

অনেক দূরে ... পাহাড়ের ওপর হতে, ... সে কোন শোকাতুরা মাতার কাঁদনের রেশ ভেসে আসছিল, 'আহ্—আহ্ আহ্।' ... আরবি ঘোড়ার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটার পাষাণে আহত শব্দ শোনা গেল—খট খট খট ! ! !

[ঙ]

করাচি

(মেঘম্লান সন্ধ্যা,—সাগর বেলা)

আমি আজ কাঙাল না রাজাধিরাজ ? বন্দী না মুক্ত ? পূর্ণ না রিক্ত ? ...

একা এই ম্লান মৌন আরব সাগরের বিজনবেলায় বসে তাই ভাবছি আর ভাবছি। আর আমার মাথার ওপর মুক্ত আকাশ বেয়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টি ঝরছে—রিম ঝিম ঝিম !

বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী

[ক]

[বাঙালি পল্টনের একটি বওয়াটে যুবক আমার কাছে তাহার কাহিনী বলিয়াছিল নেশার ঝোঁকে : নিচে তাহাই লেখা হইল। সে বোগদাদে গিয়া মারা পড়ে।]

'কি ভায়া ! নিতান্তই ছাড়বে না? একদম এঁটেল মাটির মতো লেগে থাকবে? আরে, ছোঃ ! তুমি যে দেখছি চিটে গুড়ের চেয়েও চামচিটেল ! তুমি যদিও হচ্ছ আমার এক গ্লাসের ইয়ার, তবুও সত্যি বলতে কি, আমার সেসব কথাগুলো বলতে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়। কারণ খোদা আমায় পয়দা করবার সময় মস্ত একটা গলদ করে বসেছিলেন, কেননা চামড়াটা আমার করে দিলেন হাতির চেয়েও পুরু, আর প্রাণটা করে দিলেন কাদার চেয়েও নরম ! আর কাজেই দু-চার জন মজুর লাগিয়ে আমার এই চামড়ায় মুগুর বসালেও আমি গোঁপে তা দিয়ে বলব, 'কুচ পরওয়া নেই', কিন্তু আমার এই 'নাজোক' জানটায় একটু আঁচড় লাগলেই ছোট্ট মেয়ের মতো চেঁচিয়ে উঠব ! তোমার 'বিরাশি দশ আনা' ওজনের কিলগুলো আমার এই স্থূল চর্মে স্রেফ আরাম দেওয়া ভিন্ন আর কোনো ফলোৎপাদন করতে পারে না, কিন্তু যখনই পাকড়ে বসো, 'ভাই, তোমার সকল কথা খুলে বলতে হবে', তখন আমার অন্তরাত্মা ধুকধুক করে ওঠে,—পৃথিবী ঘোরার ভৌগোলিক সত্যটা তখন হাড়ে হাড়ে অনুভব করি। চক্ষেও যে সর্ষপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হতে পারে বা জোনাকি পোকা জ্বলে উঠতে পারে, তা আমার মতো এই রকম শোচনীয় অবস্থায় পড়লে তুমিও অস্বীকার করবে না।

[খ]

'হাঁ, আমার ছোটকালের কোনো কথা বিশেষ ইয়াদ হয় না। আর আবছায়া রকমের একটু একটু মনে পড়লেও তাতে তেমন কোনো রস বা রোমান্স (বৈচিত্র্য) নেই !—সেই সরকারি রাম-শ্যামের মতো পিতামাতার অত্যধিক স্নেহ, পড়ালেখায় নবডঙ্কা, ঝুলঝাপপুর ডাণ্ডাগুলি খেলায় 'দ্বিতীয় নাস্তি', দুষ্টামি-নষ্টামিতে নন্দদুলাল কৃষ্ণের তদানীন্তন অবতার, আর ছেলেদের দলে অপ্রতিহত প্রভাবে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের ক্ষুদ্র সংস্করণ ! আমার অনুগ্রহে ও নিগ্রহে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিশেষ খোশ ছিলেন কিনা, তা আমি

কারুর মাথায় হাত দিয়ে বলতে পারি না ; তবে সকলেই আমার পরমার্থ কল্যাণের জন্য যে সকাল-সন্ধ্যে প্রার্থনা করত সেটা আমার তীক্ষ্ণ শ্রবণেন্দ্রিয় না-ওয়াকেফ ছিল না। একটা প্রবাদ আছে, 'উৎপাত করলেই চিৎপাত হতে হয়।' সুতরাং এটা বলাই বাহুল্য যে, আমার পক্ষেও উক্ত মহাবাক্যটির ব্যতিক্রম হয়নি, বরং ও কথাটা ভয়ানকভাবেই আমার উপর খেটেছিল ; কারণ ঘটনাচক্রে যখন আমি আমার জননীর কক্ষচ্যুত হয়ে সংসারের কর্মবহুল ফুটপাথে চিৎপাত হয়ে পপাত হলুম, তখন কত শত কর্মব্যস্ত সবুট-ঠ্যাং যে অহম-বেচারার ব্যথিত পাঁজরের উপর দিয়ে চলে গেল, তার হিসেব রাখতে শুভঙ্কর দাদাও হার মেনে যায়।—থাক আমার সেসব নীরস কথা আউড়িয়ে তোমার আর পিত্তি জ্বালাব না। শুনবে মজা?

একদিন পাঠশালায় বসে আমি বঙ্কিমবাবুর মুচিরাম গুড়ের অনুকরণে ছেলেদের মজলিস সর-গরম করে আবৃত্তি করছিলুম, 'মানময়ী রাধে! একবার বদন তুলে গুড়ুক খাও!' এতে শ্রীমতী রাধার মানভঞ্জন হয়েছিল কিনা জানবার অবসর পাইনি, কারণ নেপথ্যে ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে 'আরে রে, দুর্বৃত্ত পামর' বলে হুঙ্কার করে আমার ঘাড়ে এসে পড়লেন সশরীরে আমাদের আর্কমার্কা পণ্ডিতমশাই। যবনিকার অন্তরালে যে যাত্রার দলের ভীম মশাইয়ের মতো ভীষণ পণ্ডিমশাই অবস্থান করছিলেন, তা এ নাবালকের একেবারেই জানা ছিল না!—তার ক্রোধ-বহ্নি যে দুর্বাসার চেয়েও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল তা আমি বিশেষরকম উপলব্ধি করলুম তখন, যখন তিনি একটা প্রকাণ্ড মেষের মতো এসে আমার নাতিদীর্ঘ শ্রবণেন্দ্রিয় দুটি ধরে দেওয়ালের সঙ্গে মাথাটার বিষম সংঘর্ষণ আরম্ভ করলেন। তখনকার পুরোদস্তুর সংঘর্ষণের ফলে কোনো নূতন বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার উদ্ভাবন হয়নি সত্য, কিন্তু আমার সর্ব শরীরের 'ইলেকট্রিসিটি' যে সাংঘাতিক রকম ছুটাছুটি করেছিল, সেটা অস্বীকার করতে পারব না। মার খেয়ে খেয়ে ইটপাটকেলের মতো আমার এই শক্ত শরীরটা যত না কষ্ট অনুভব করেছিল, তাঁর সালঙ্কার গালাগালির তোড়ে তার চেয়ে অনেক কষ্ট অনুভব করেছিল আমার মনটা। আদৌ মুখরোচক নয় এরূপ কতকগুলো অখাদ্য তিনি আমার পিতৃপুরুষের মুখে দিচ্ছিলেন, এবং একেবারেই সম্ভব নয় এরূপ কতকগুলো ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দাবি আমার কাছে করেছিলেন। তাঁর পাঁচপুয়া পরিমিত চৈতন্য চুটকিটা ভেক-ছানাসম শিরোপরি অস্বাভাবিক রকমের লম্ফ-ঝম্প প্রদান করছিল। সঙ্গে সঙ্গে খুব হাসিও পাচ্ছিল, কারণ 'চৈতন তেড়ে ওঠার' নিগূঢ় অর্থ সেদিন আমি সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলুম! ক্রমে যখন দেখলুম, তাঁর এ প্রহারের কবিতায় আদৌ যতি বা বিরামের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, তখন আর বরদাস্ত হলো না! জানো তো, পুরুষের রাগ আনাগোনা করে আমিও তাই, ঐখানেই একটা হেস্তনেস্ত করে দেবার অভিপ্রায়ে তার খাঁড়ার মতো নাকটায় বেশ মাঝারি গোছের একটা ঘুষি বাগিয়ে দিয়ে বীরের মতো সটান স্বগৃহাভিমুখে হাওয়া দিলুম। বাড়ি গিয়েও আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করলুম না। তাই পিতৃভয়ে সেঁধুলম গিয়ে একেবারে চালের মরাইয়ে ; উদ্দেশ্য, এরূপ নিভৃত স্থান হতে কেউ আর সহজে আবিষ্কার করতে পারবে

না—কি জানি কখন কি হয়! খানিক পরে—আমার সেই গুপ্তপুর হতেই শুনতে পেলুম পণ্ডিতমশাই ততক্ষণে সালঙ্কারে আমার জন্মদাতার কাছে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিলেন যে, আমার মতো দুর্ধর্ষ বাউণ্ডেলে ছোকরার লেখা-পড়া তো 'ক' অক্ষর গোমাংস, তদুপরি গুরুমশাইয়ের নাসিকায় গুরুপ্রহার ও গুরুপত্নীর নিন্দাবাদ অপরাধে আপাতত এই দুনিয়াতেই আমাকে লোখুঠুটোর মতো চাটু হস্তে মাছি মারতে হবে, অর্থাৎ কুষ্ঠব্যাধি হবে, তারপর নরকে যাতে আমার 'স্পেশাল' (বিশেষ) শাস্তির বন্দোবস্ত হয়, তার জন্যেও নাকি তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে ঠিকঠাক করতে পারেন! প্রথমত অভিশাপটার ভয়ে একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলুম। গুরুপত্নীর নিন্দাবাদ কথাটা আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি, পরে অবগত হলুম, পণ্ডিতমশাইয়ের অর্ধাঙ্গিনীর নামও নাকি শ্রীমতী রাধা,—আর তাঁর এক-আধটু গুড়ুক খাওয়ারও নাকি অভ্যাস আছে, অবিশ্যি সেটা স্বামীদেবতার অগোচরেই সম্পন্ন হয়, আমি নাকি তাই দেখে এসে ছেলেদের কাছে স্বহস্তে গুড়ুক সেজে অভিমানিনী শ্রীমতী রাধার মানভঞ্জনার্থ করুণ মর্মস্পর্শী সুরে উপরোধ করছিলুম,—'মানময়ী রাধে, একবার বদন তুলে গুড়ুক খাও'—আর পণ্ডিতমশাই অন্তরালে থেকে সব শুনছিলেন।—আমার আর বরদাশত হলো না, চালের মরাইয়ে থেকেই উসখুস করতে লাগলুম, ইতিমধ্যে গরমেও আমি রীতিমত গলদঘর্ম হয়ে উঠেছিলুম। আমি মোটেই জানতুম না পণ্ডিতমশাইয়ের গিন্নীর নাম শ্রীমতী রাধা—আর তিনি যে গুড়ুক খান, তা তো বিলকুলই জানতুম না। কাজেই এতগুলো সত্যের অপলাপে আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পারলুম না, তুড়ুক করে চালের মরাই হতে পিতৃসমীপে লাফিয়ে পড়ে, আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্যে অশ্রুগদগদ-কণ্ঠে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ প্রয়োগ করতে লাগলুম, কিন্তু ততক্ষণে ক্রোধান্ধ পিতা আমার আপিল অগ্রাহ্য করে ঘোড়ার গোগালচির মতো আমার সামনের লম্বা চুলগুলো ধরে দমাদ্দম প্রহার জুড়ে দিলেন। বাস্তবিক, সে রকম প্রহার আমি জীবনে আশা করিনি।—চপেটাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, পদাঘাত ইত্যাদি চার হাত-পায়ের যত রকম আঘাত আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, সব যেন রবিবাবুর গানের ভাষার 'শ্রাবণের ধারার মতো' পড়তে লাগল আমার মুখের 'পরে—পিঠের 'পরে। সেদিনকার পিটুনি খেয়ে আমার পৃষ্ঠদেশ বেশ বুঝতে পেয়েছিল যে, তার 'পিঠ' নাম সার্থক হয়েছে। একেই আমাদের ভাষায় বলে, 'পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেওয়া।' বৃন্দাবন না দেখি তার পরদিনই কিন্তু বাবা আমায় বর্ধমান এনে 'নিউ স্কুলে' ভর্তি করে দিলেন! কি করি, আমি নাচারের মতো সব সহ্য করতে লাগলুম।—কথায় বলে 'ধরে মারে, না সয় ভালো।'

[গ]

'প্রথম প্রথম শহরে এসে আমার মতো পাড়াগেঁয়ে গোঁয়ারকে বিষম বিব্রত হয়ে উঠতে হয়েছিল, বিশেষ করে শহুরে ছোকরাদের দৌরাত্ম্যিতে। সে ব্যাটারা পাড়াগেঁয়ে

ছেলেগুলোকে যেন ইঁদুর-প্যাঁচার মতো পেয়ে বসে। যাহোক, অল্পদিনেই আমি শহুরে কায়দায় কেতা-দুরস্ত হয়ে উঠলুম! ক্রমে 'অহম' পাড়া-গেঁয়ে ভূতই আবার তাদের দলের একজন হুমরো-চুমরো ওস্তাদ ছোকরা হয়ে পড়ল। সেই—আগেকার পগেয়া—খচ্চর ছেলেগুলোই এখন আমায় বেশ একটু সমীহ করে চলতে লাগল।—বাবা, এ শর্মার কাছে বেঁড়ে-ওস্তাদি, এ ছেলে হচ্ছে অষ্টধাতু দিয়ে তৈরি! দেখতে দেখতে পড়ালেখায় যত না উন্নতি করলুম, তার চেয়ে বহুল পরিমাণে উন্নতি করলুম রাজ্যের যত দুষ্টুমির গবেষণায়। তখন আমায় দেখলে বর্ধমানের মতো পবিত্র স্থানও তটস্থ হয়ে উঠত। ক্রমে আমাদের মস্ত একটা দল পেকে উঠল। পুলিশের ঘাড়ে দিনকতক এগারো-ইঞ্চি ঝাড়তেই তারা আমাদের সঙ্গে গুপ্ত সন্ধি করে ফেললে। এইরূপে ক্রমেই আমি নিচু দিকে গড়িয়ে যেতে লাগলুম—তাই বলে যে আমাদের দিয়ে কোনো ভালো কাজ হয়নি, তা বলতে পারবে না। মিশন, কুষ্ঠরোগ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে আমাদের এই বওয়াটে ছেলেদের দল যা করেছে তার শতাংশের একাংশও করে উঠতে পারেনি ঐ গোবেচারা নিরীহ ছাত্রের দল। তারা আমাদের মতো অমন অদম্য উৎসাহ-ক্ষমতা পাবে কোথায়? তারা তো শুধু বইয়ের পোকা। বর্ধমান যখন ডুবে যায়, তখন আমরাই শহরের সিকি লোককে বাঁচিয়েছিলুম, সে সময়ে আমাদের দলের অনেকে নিজের জীবন উৎসর্গ করে আর্তের জীবন রক্ষা করেছি! কনফারেন্সের, সভা-সমিতির চাঁদা আদায়ের প্রধান উদ্যোগ আয়োজনের প্রধান পাণ্ডা ছিলুম আমরা। আমাদেরই চেষ্টায় 'স্পার্টস', 'জিমনাস্টিক', 'সার্কাস', 'থিয়েটার', 'ক্লাব' প্রভৃতির আড্ডাগুলোর অস্তিত্ব অনেকদিন ধরে লোপ পায়নি।

পিতার অবস্থা খুব সচ্ছল না হলেও মাসোহারাটা ঠিকরকমই পাঠাতেন। তিনি তো আর আমার এতদূর উন্নতির আশা করেননি, আর এত খবরও রাখতেন না। কারণ কোনো ক্লাসে আমার 'প্রমোশন' স্টপ হয়নি। বহু গবেষণার ফলেও হেড মাস্টার মহাশয় আবিষ্কার করতে পারেননি—আমার মতো বওয়াটে ছোকরা কি করে পাসের নম্বর রাখে। ভায়া, ঐখানেই তো genius-এর (প্রতিভার) পরিচয়!—'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।' পরীক্ষার সময় চার-পাঁচজোড়া অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আমার পেছনে লেগে থাকতই, কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যার কূল-কিনারা পান না, তাকে ধরবেন 'পদীর ভাই গৌরীশঙ্কর'। তাছাড়া খালি চুরি বিদ্যায় কি চলে? এতে অনেক মাথা ঘামাতে হয়। পরীক্ষকের ঘর হতে তাঁর ছেলে বা অন্য কোনো ক্ষুদ্র আত্মীয়ের থ্রু দিয়ে রজত চক্রের বিনিময়ে খাতাটি বেমালুম বদলে ফেলা, প্রেস হতে প্রশ্ন চুরি, প্রভৃতি অনেক বুদ্ধিই এ শর্মার আয়ত্ত ছিল। সেসব শুনলে তোমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে উঠবে!—যাহোক, এই রকমেই 'যেন তেন প্রকারেণ' থার্ড ক্লাসের চৌকাঠে পা দিলুম গিয়ে।

বাড়ি খুব কম যেতুম, কারণ পাড়াগাঁ তখন আর ভালো লাগত না। পিতাও বাড়ি না গেলে দুঃখিত হতেন না, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল, আমি এইবার একটা কিছু না হয়ে যাই না। আমাদের গ্রামের কুল্লে আমিই পড়তে এসেছিলুম ইংরেজি স্কুলে, তার উপর

আমি নাকি পাশগুলো পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো তড়াক্তর ডিঙিয়ে যাচ্ছিলুম! কেবল একজনের আঁখি দুটি সর্বদাই আমার পথপানে চেয়ে থাকত, তিনি আমার স্নেহময়ী জননী! মায়ের মন তো এত শত বোঝে না, তাই দুমাস বাড়ি না গেলেই মা কেঁদে আকুল হতেন। সংসারে মার কাছ ভিন্ন আর কারুর কাছে একটু স্নেহ-আদর পাইনি। দুষ্ট বদমায়েস ছেলে বলে, আমায় যখন সকলেই মারত, ধমকাত, তখন মাই কেবল আমায় বুকে করে সান্ত্বনা দিতেন। আমার এই দুষ্টুমিটাই যেন তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগত। আমার পিঠে প্রহারের দাগগুলোয় তেল মালিশ করে দিতে দিতে কতদিন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুর নদী বয়ে গেছে!

যখন থার্ড ক্লাশে উঠলুম, তখন বোধ হয় মায়ের জিদেই বাবা আমায় চতুষ্পদ করে ফেললেন, অর্থাৎ বিয়ে দিয়ে দিলেন। আমি 'কটিদেশ বন্ধনপূর্বক' নানা ওজর আপত্তি দেখাতে লাগলুম, কিন্তু মায়ের আদালতে ও তাঁর অশ্রুজলের ওকালতিতে আমার সমস্ত ওজর বাতিল ও নামঞ্জুর হয়ে গেল। কি করি, যখন শুভদৃষ্টি হয়ে গেল, তখন তো আর কথাই নাই! তাছাড়া, কনেটি মন্দ ছিল না, আজকালকার বাজারে পাড়াগাঁয়ে ওরকম কনে শয়ে একটি মেলে না। বয়সও বারো-তেরো হয়েছিল। ঐ বারো-তেরো বছরের কিশোরীটিকেই মা নাকি সোমত্ত মেয়ে দেখে বউ করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিলেন! আমারও বয়স তখন উনিশের কাছাকাছি। এতেই নাকি মেয়েমহলে মাকে কত কথা শুনতে হতো। প্রথম প্রথম কনে বৌ একটি পুঁটুলিরই মতো জড়সড় হয়ে তার নির্দিষ্ট একটি কোণে চুপ করে বসে থাকত। নববধূদের নাকি চোখ তেড়ে চাইতে নেই, তাই সে প্রায়ই চোখ বুজে থাকত। কিন্তু অনবরত চোখ বুজে থাকা, সেও যে এক বীভৎস ব্যাপার, তাই সে দু-একবার অন্যের অলক্ষ্যে ভয়-চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে নিত, যদি তার এই বেহায়াপনা কেউ দেখে ফেলে, তাহলেই মহাভারত অশুদ্ধ আর কি! আমাকে দেখলে তো আর কথাই নেই, নিজেকে কাছিমের মতো তৎক্ষণাৎ শাড়ি ওড়না প্রভৃতির ভিতর ছাপিয়ে ফেলত। তখন একজন প্রকাণ্ড অনুসন্ধিৎসু লোকের পক্ষেও বলা দুঃসাধ্য হয়ে উঠত, ওটা মানুষ, না কাপড়ের একটা বোঁচকা! তবে এটা আমার দৃষ্টি এড়াত না যে, আমি অন্যদিকে চাইলেই সে তার বেনারসি শাড়ির ভিতর থেকে চুরি করে আমার দিকে চেয়ে দেখত, কিন্তু আমি তার দিকে চাইতে না চাইতেই সে সটান চোখ দুটোকে বুজে ফেলে গম্ভীর হয়ে বসে থাকত, যেন আমায় দেখবার তার আদৌ গরজ নাই। আমি মুখ টিপে হাসতে হাসতে পালিয়ে এসে বাড়িময় উচ্চৈঃস্বরে বউয়ের লজ্জাহীনতার কথা প্রকাশ করে ফেলতুম। মা তো হেসেই অস্থির। বলতেন, 'হ্যাঁরে, তুই কি জনমভর এই রকম ক্ষ্যাপাই থাকবি?' আমার ভগ্নিগুলি কিন্তু কিছুতেই ছাড়বার পাত্রী নন, তাঁরা বউয়ের রীতিমতো কৈফিয়ত তলব করতেন। সে বেচারির তখনকার বিপদটা ভেবে আমার খুব আমোদ হতো, আমি হেসে লুটোপুটি যেতুম। যাহোক এ একটা খেলা মন্দ লাগছিল না। ক্রমে আমি বুঝতে পারলুম, কিশোরী কনে' আমায় ভালোবাসতে আরম্ভ করেছে। আমি কিন্তু পারতপক্ষে তাকে

জ্বালাতন করতে ছাড়তুম না। আমার পাগলামির ভয়ে সে বেচারি আমার সঙ্গে চোখাচোখি চাইতে পারত না, কিন্তু দরজার ফাঁক দিয়ে সে যে আমার পানে তার পটলচেরা চোখ দুটির ভাসা-ভাসা করুণ দৃষ্টি দিয়ে হাজার বার চেয়ে দেখত, তা আমি স্পষ্টই বুঝতে পারতুম, আর গুন গুন স্বরে গান ধরে দিতুম—

'সে যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়ানে
কেন, কি বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে।'

ক্রমে আমারও ভালোবাসা এই ছেলেমির মধ্যে দিয়ে এক আধটু করে বেরিয়ে পড়তে লাগল। তারপর পরীক্ষা নিকট দেখে শুভাকাঙ্ক্ষী পিতা আমার আর বাড়িতে থাকা নিরাপদ বিবেচনা করলেন না। আমি চ'লে আসার দিনে আর জ্যাঠামি দিয়ে হৃদয় লুকিয়ে রাখতে পারিনি। হাসতে গিয়ে অশ্রুজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত করেছিলুম। সজল নয়নে তার হাত দুটি ধরে বলেছিলুম, 'আমার সকল দুষ্টুমি ক্ষমা করো লক্ষ্মীটি, আমায় মনে রেখো।' সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলে না, কিন্তু তার ঐ চোখের জলই যে বলে দিলে সে আমায় কত ভালোবেসে ফেলেছে। আমি ছেড়ে দেবার পর সে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে অব্যক্ত স্বরে কাঁদতে লাগল। আমি চোখে রুমাল চেপে কোনো রকমে নিজের দুর্বলতাকে সম্বরণ করে ফেললুম। কে জানত, আমার সেই প্রথম সম্ভাষণই শেষ বিদায়-সম্ভাষণ—আমার সেই প্রথম চুম্বনই শেষ চুম্বন! কারণ, আর তাকে দেখতে পাইনি। আমি চলে আসবার মাস দুই পরেই পিত্রালয়ে সে আমায় চিরজনমের মতো কাঁদিয়ে চলে যায়। প্রথম যখন সংবাদটা পেলুম, তখন আমার কিছুতেই বিশ্বাস হলো না। এত বড় দুঃখ দিয়ে সে আমায় চলে যাবে? আমার এই আহত প্রাণ চিৎকার করে কাঁদতে লাগল, 'না গো না, সে মরতেই পারে না! স্বামীকে না জানিয়ে সে এমন করে চলে যেতেই পারে না। সব শত্রু হয়ে তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা জানিয়েছে।' আমি পাগলের মতো রাবেয়াদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলুম। আমায় দেখে তাদের পুরানো শোক আবার নতুন করে জেগে উঠল। বাড়িময় এক উচ্চ ক্রন্দনের হাহাকার রোল আমার হৃদয়ে বজ্রের মতো এসে বাজল। আমি মূর্ছিত হয়ে পড়লুম।—ওগো, আর তার মৌন অশ্রুজল আমার পাষাণ বক্ষ সিক্ত করবে না? একটি কথাও যে বলতে পারেনি সে! সে যাবে না, ককখনো যাবে না। 'হায় অভিমানিনি! ফিরে এস! ফিরে এস!'

সে এল না, যখন নিঝুম রাত্তির, কেউ জেগে নেই, কেবল একটা 'ফেরু' ফেউ ফেউ চিৎকার করে আমার বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর করে তুলছিল, তখন একবার তার গোরের উপর গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লুম—'রাবেয়া! প্রিয়তমে! একবার ওঠো, আমি এসেছি, সকল দুষ্টুমি ছেড়ে এসেছি। আমার সারা বক্ষ জুড়ে যে তোমারই আলেখ্য আঁকা তাই দেখাতে এই নিভৃত গোরস্থানে নীরব যামিনীতে একা এসেছি। ওঠো, অভিমানিনী রাবেয়া আমার, কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না।' কবর ধরে সমস্ত রাত্তির কাঁদলুম, রাবেয়া এল না। আমার চারিদিকে একটা ঘূর্ণিবায়ু হুহু করে কেঁদে ফিরতে লাগল, ছোট্ট শিউলি গাছ থেকে শিশিরসিক্ত ফুলগুলো আমার মাথায় ঝ'রে পড়তে লাগল। ও আমার রাবেয়ার

অশ্রুবিন্দু, না কারুর সান্ত্বনা? দুএকটা ধসে যাওয়া কবরে দপ দপ করে আলেয়ার আলো জ্বলে উঠতে লাগল। আমি শিউরে উঠলুম। তখন ভোর হয়ে গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সর্বাঙ্গে তার কবরের মাটি মেখে আবার ছুটে এলুম বর্ধমানে। হায়, সে তো চলে গেল, কিন্তু আমার প্রাণে স্মৃতির যে আগুন জ্বেলে গেল সে তো আর নিবল না। সে আগুন যে ক্রমেই বেড়ে চলছে, আমার বুক যে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। এই প্রাণ-পোড়ানো স্মৃতির আগুন ছাড়া একটা কোনো নিদর্শন যে সে রেখে যায়নি, যাতে করে আমার প্রাণে এতটুকু সান্ত্বনা পেতুম।

সেই যে আঘাত পেলুম, তাতেই আমার বুকের পাঁজর ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। আমি আর উঠতে পারলুম না।

[ঘ]

'দিন যায়, থেমে থাকে না। আমারও নীরস দিনগুলো কেটে যেতে লাগল কোনো রকমে। ক্রমে ফার্স্ট ক্লাসে উঠলুম। তখন অনেকটা শুধরেছি। ইতিমধ্যে বর্ধমান নিউ স্কুল উঠে যাওয়ায়, তাছাড়া অন্য জায়গায় গেলে কতকটা প্রকৃতিস্থ হতে পারব আশায়, আমি রানিগঞ্জে এসে পড়তে লাগলুম। আমাদের ভূতপূর্ব হেড-মাস্টার রানিগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ-স্কুলের হেড-মাস্টারি পদ পেয়েছিলেন। তাঁর পুরানো ছাত্র বলে তিনি আমায় স্নেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন, আমিও পড়া-লেখায় একটু মন দিলুম। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটা বিভ্রাট বেধে গেল, আমার আবার বিয়ে হয়ে গেল। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে, আমি এ বিয়েতে কোনো ওজর-আপত্তি করিনি। তখন আমার মধ্যে সে উৎসাহ, সে একগুঁয়েমি আর ছিল না। রাবেয়ার মৃত্যুর সঙ্গে আমি যেন একেবারেই পরনির্ভরশীল বালকের মতো হয়ে পড়লুম। যে যা বলত তাতে উদাসীনের মতো 'হাঁ' বলে দিতুম। কোনো জিনিস তলিয়ে বুঝবার বা নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করবার ক্ষমতা যেন তখন আমার আদৌ ছিল না। আমার পাগলামি, হাসি সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। এইসব দেখেই বোধ হয় মা আমার আবার বে' দেবার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া আমি আরো ভেবেছিলুম হয়তো এই নবোঢ়ার মধ্যেই আমার রাবেয়াকে ফিরে পাব, আর তার স্নেহকোমল স্পর্শ হয়তো আমার বুকের দারুণ শোক-যন্ত্রণার মধ্যে শান্তি আনতে পারবে। কিন্তু হায়! যার জীবন চিরকালই এই রকম বিষাদময় হবে বলে বিধাতার মন্তব্য-বহিতে লিখিত হয়ে গেছে, তার 'সবর' ও 'শোকর' ভিন্ন 'নান্যগতি'। তার কপাল চিরদিনই পুড়বে। নববধূ সখিনা দেখতে শুনতে মন্দ নয়, তাই বলে ডানাকাটা পরিও নয়; আর আমার নিজের চেহারার গুণ বিচার না করে ওরকম একটি পরির কামনা করাও অন্যায় ও ধৃষ্টতা। গুণও আমার তুলনায় অনেক বেশি, সেসব বিষয়ে কোথাও খুঁৎ ছিল না। আজকালকার ছোকরারা নিতান্ত বেহায়ার মতো নিজে বৌ পছন্দ করে আনে। নিজের শরীর যে আবলুস কাঠের চেয়েও কালো বা কেঁদ কাঠের

চেয়েও এবড়োথেবড়ো সেদিকে দৃষ্টি নেই, কিন্তু বৌটির হওয়া চাই দস্তুরমতো দুধে-আলতার রং, হরিণের মতো নয়ন, অন্তত পটলচেরা তো চাই-ই, সিংহের মতো কটিদেশ, চাঁদের মতো মুখ, কোকিলের মতো কণ্ঠস্বর, রাজহংসীর মতো গমন ; রাতুল চরণকমল, কারণ মানভঞ্জনের সময় যদি 'দেহি পদপল্লবম উদাম' বলে তাঁর চরণ ধরে ধন্না দিতে হয়, আর সেই যে চরণ যদি God forbid (খোদা না করেন) গদাধরের পিসির ঠ্যাং-এর মতোই শক্ত কাঠপারা হয়, তাহলে বেচারারা একটা আরাম পাওয়া হতে যে বঞ্চিত হয়, আর বেজায় রসভঙ্গও হয়। তৎসঙ্গে আরো কত কি কবিপ্রসিদ্ধির চিজবস্তু, সেসব আমার আর এখন ইয়াদ নেই। এইসব বোকারা ভুলেও ভাবে না যে, মেয়েগুলো নিতান্ত সতীলক্ষ্মী গোবেচারা জাত হলেও তাদেরও একটা পসন্দ আছে। তারাও ভালো বর পেতে চায়। আমরা যত সব পুরুষ মানুষ বেজায় স্বার্থপর বলে তাদের কোনো কষ্ট দেখেও দেখিনে। মেয়েদের 'বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না' ভাব আমি বিলকুল না-পছন্দ করি। অন্তত যার সঙ্গে সারা জীবনটা কাটাতে হবে, পরোক্ষেও যদি তার সম্বন্ধে বেচারিরা কিছু বলতে কইতে না পায়, তবে তাদের পোড়াকপালি নাম সার্থক হয়েছে বলতে হবে। থাক, আমার মতো চুটোপুঁটির এসব ছেঁদো কথায় বিজ্ঞ সমাজ কেয়ার তো করবেনই না, অধিকন্তু হয়তো আমার মস্তক লোমশূন্য করে তা'তে কোনো বিশেষ পদার্থ ঢেলে দিয়ে তাঁদের সীমানার বাইরে তাড়িয়ে দিবেন। অতএব আমি নিজের কথাই বলে যাই।

নব-পরিণীতা সখিনার এসব গুণ থাকা সত্ত্বেও আমি তাকে ভালোবাসতে পারলুম না। অনেক 'রিহার্স্যাল' দিলুম, কিছুতেই কিছু হলো না। হৃদয় নিয়ে এ ছিনিমিনি খেলার অভিনয় যেন আর ভালো লাগছিল না। তাছাড়া তুমি বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না, রাবেয়া যেন আমার হৃদয় জুড়ে রানির মতো সিংহাসন পেতে বসেছিল, সেখানে অন্য কারুর প্রবেশাধিকার ছিল না। একনিষ্ঠ প্রেমে মানুষকে এতটা আত্মহারা যদি না করে ফেলত তবে 'কায়েস' 'মজনু' হয়ে লায়লির জন্য এমন করে বনে-পাহাড়ে ছুটে বেড়াত না, ফরহাদের ও-রকম পরিণাম হতো না। সখিনা কত ব্যথা পাচ্ছে বুঝতে পারতুম, কিন্তু হায় বুঝেও কিছু করতে পারতুম না। বিবাহিতা পত্নীর প্রতি কর্তব্যের অবহেলা আমার বুকে কাঁটার মতো বিঁধছিল। মা ক্ষুণ্ন হলেন, বোনেরা বউকেই দোষী সাব্যস্ত করে তামিল করতে লাগল। কিন্তু কোথায় কি ফাঁক রয়ে গেল জানি না, কিছুতেই তার হৃদয়ের সঙ্গে আমার হৃদয়ের মিশ খেল না। সে কেঁদে মাটি ভিজিয়ে দিলে, তবু আমার মন ভিজল না। অনুশোচনার ও বাক্যজ্বালার যন্ত্রণায় বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এলুম। রাবেয়া আমার বুকে যে আঘাত করে গিয়েছিল তাই সইতে পারছিলুম না, তার উপর—হা খোদা, একি করলুম নিতান্ত অর্বাচীনের মতো? এ হতভাগিনীর জীবন কেন আমার সঙ্গে এমন করে জড়িয়ে ফেলুলম? অসহ্য এই বৃশ্চিক যন্ত্রণা কাঁটার ছুরির মতো আমার আগেকার আঘাতটায় খোঁচা মারতে লাগল। আমি পাগল হয়ে যাবার মতো হলুম। এরই মধ্যে রানিগঞ্জে এসে 'টেস্ট একজামিনেশন' দিলুম। সমস্ত বছর হট্টগোলে কাটিয়েছি। পাশ করব কোত্থেকে? আগেকার সে চুরি বিদ্যায়ও

প্রবৃত্তি ছিল না—অর্থাৎ এখন সাফ বুঝতে পাচ্ছ যে, টেস্টে এলাউ হইনি ; সুতরাং ওটা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন? এই শুভ সংবাদ বাবার কর্ণগোচর হবা মাত্র তিনি কিঞ্চিদধিক এক দিস্তা কাগজ খরচ করে আমায় বিচিত্র সম্ভাষণের উপসংহারে জানিয়ে দিলেন যে, আমার মতো কুপুত্তুরের লেখাপড়া ঐখানেই খতম হবে তা তিনি বহু পূর্বেই আন্দাজ করে রেখেছিলেন,—অনর্থক এক রাশ টাকা জলে ফেলে দিলেন ইত্যাদি। আমার জানটা তেতোবেরক্ত হয়ে উঠল। দুত্তোর বলে দফতর গুটালুম ; পরে, যা মনে আসতে লাগল তাই করতে লাগলুম। লোকে আমায় বহরমপুর যাবার জন্য বিনা ফি-তে যেচে উপদেশ দিতে লাগল। আমি তাদের কথায় 'ড্যামকেয়ার' করে দিনরাত বোঁ হয়ে রইলুম। দু-চারদিন সইতে সইতে শেষে একদিন বোর্ডিং সুপারিনটেন্ডেন্ট মশাই শুভক্ষণে আমায় অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় দিলেন। আমি ফের বর্ধমানে চলে এলুম। আমাদের ছত্রভঙ্গ দলের ভূতপূর্ব গুণ্ডাগণ আমায় সাদরে বরণ করে নিল। পিতা সব শুনে আমায় ত্যাজ্যপুত্র করলেন। এক বৎসর পরে খবর এল সখিনা আমায় নিষ্ঠুর পরিহাস করে অজানার রাজ্যে চলে গেছে। মরবার সময়ও নাকি হতভাগিনী আমার মতো পাপিষ্ঠের চরণ-ধুলোর জন্য কেঁদেছে, আমার ছেঁড়া পুরানো একটা ফটো বুকে ধরে মরেছে। ক্রমেই আমার রাস্তা ফর্সা হতে লাগল। আরো ছয় মাস পরে মা-ও চলে গেলেন। আমি তখন অট্টহাসি হেসে বোতলের পর বোতল উড়াতে লাগলুম। তারপর শুভক্ষণে পল্টনে এসে সেঁধিয়ে পড়লুম বোম কেদার নাথ বলে ! আর এক গ্লাস জল দিতে পারো ভাই?

মেহের-নেগার

[ক]

ঝিলম

বাঁশি বাজছে, আর এক বুক কান্না আমার গুমরে উঠছে! আমাদের ছাড়াছাড়ি হলো তখন, যখন বৈশাখের গুমোটভরা উদাস-মদির সন্ধ্যায় বেদনাতুর পলু-বারোয়া রাগিণীর ক্লান্ত কান্না হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বেরুচ্ছিল! আমাদের দুজনারই যে এক-বুক করে ব্যথা, তার অনেকটা প্রকাশ পাচ্ছিল ঐ সরল-বাঁশের বাঁশির সুরে। উপুড়-হয়ে পড়ে-থাকা সমস্ত স্তব্ধ ময়দানটার আশেপাশে পথ হারিয়ে গিয়ে তারই উদাস প্রতিধ্বনি ঘুরে মরছিল। দুষ্টু দয়িতকে খুঁজে খুঁজে বেচারা কোকিল যখন হয়রান পেরেশান হয়ে গিয়েছে, আর অশান্ত অশ্রুগুলো আটকে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টায় বারম্বার চোখ দুটোকে ঘষে ঘষে কলিজার মতো রক্ত-লোহিত করে ফেলেছে, তখন তরুণী কোয়েলিটা তার প্রণয়ীকে এই ব্যথা দেওয়ায় বোধ হয় বাস্তবিকই ব্যথিত হয়ে উঠেছিল,—কেননা, তখখনই কলামোচার আম গাছটার আগডালে কচি আমের খোকার আড়ালে থেকে মুখ বাড়িয়ে সকৌতুকে সে কুক দিয়ে উঠল 'কূ—কূ—কূ!' বেচারা শ্রান্ত কোকিল তখন রুদ্ধকণ্ঠে তার এই পাওয়ার আনন্দটা জানাতে আকুলিবিকুলি করে চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু ডেকে ডেকে তখন তার গলা বসে গিয়েছে, তবু অশোক গাছ থেকে ঐ ভাঙা গলাতেই তার যে চাপা বেদনা আটকে যাচ্ছিল, তারই আঘাত খেয়ে সাঁঝের বাতাস ঝিলমতীরের কাশের বনে মুহুর্মুহু কাঁপন দিয়ে গেল।

আমি ডাক দিলুম, 'মেহের-নেগার!' কাশের বনটা, তার হাজারো শুভ্রশীষ দুলিয়ে বিদ্রূপ করলে, '... আ ... র!' ঝিলমের ওপারের উঁচু চরে আহত হয়ে আমারই আহ্বান কেঁদে ফেললে, আর সে রুদ্ধশ্বাসে ফিরে এসে এইটুকু বলতে পারলে, 'মেহের—নেই—আর!'

পশ্চিমে সূর্যের চিতা জ্বলল এবং নিবে এল। বাঁশির কাঁদন থামল। মলয়-মারুত পারুল বনে নামল বড় বড় শ্বাস ফেলে। পারুল বললে, 'উ-হু—মলয় বললে, 'আ—হ্—আঃ!'

আমি বুক ফুলিয়ে চুল দুলিয়ে মনটাকে খুব একচোট বকুনি দিয়ে আনন্দভৈরবী আলাপ করতে করতে ফিরলুম—আমার মতো অনেক হতভাগাই ঐ ব্যথাবিজড়িত চলার পথ ধরে। এমন সাধা গলাতেও আমার সুরটার কলতান শুধু হোঁচট খেয়ে লজ্জায়

মরে যাচ্ছিল। আমার কিন্তু লজ্জা হচ্ছিল না। আমার বন্ধু তানপুরাটা কোলে করে তখন শ্রীরাগ ভাঁজছেন দেখলুম। তিনি হেসে বললেন, 'কি য়ুসোফ। এ-আসন্নসন্ধ্যা বুঝি তোমার আনন্দ-ভৈরবী আলাপের সময়? তুমি যে দেখছি অপরূপ বিপরীত!' আমার তখন কান্না আসছিল। হেসে বললুম, 'ভাই তোমার শ্রীরাগেরও তো সময় পেরিয়ে গেছে?' সে বললে 'তাই তো! কিন্তু তোমার হাসি আজ এত করুণ কেন,—ঠিক পাথর-কোঁদা মূর্তির হাসির মতো হিম-শীতল আর জমাট?' আমি উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চলতে লাগলুম।

আদরিণী অভিমানী বধূর মতো সন্ধ্যা তার মুখটাকে ক্রমশই কালিপানা আঁধার করে তুলছিল। এমন সময় কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথির এক-আকাশ তারা তাকে ঘিরে বললে, 'সন্ধ্যারানি! বলি এত মুখভার কিসের? এত ব্যস্ত হসনে লো, ঐ—চন্দ্রদেব এল বলে।' অপ্রতিভ বেচারি সন্ধ্যার মুখে জোর করে হাসার সলজ্জ-মলিন ঈষৎ আলো ফুটে উঠল। চাঁদ এল মদখোর মাতালের মতো টলতে টলতে, চোখ মুখ লাল করে। এসেই সে জোর করে সন্ধ্যা-বধূর আবরু ঘোমটা খুলে দিলে। সন্ধ্যা হেসে ফেললে। লুকিয়ে-দেখা বৌ-ঝির মতো একটা পাখি বকুল গাছে থেকে লজ্জারাঙা হয়ে টিটকারি দিয়ে উঠল, 'ছি—ছি!' তারপর চাঁদে আর সন্ধ্যায় অনেক ঝগড়াঝাটি হয়ে সন্ধ্যার চিবুক আর গাল বেয়ে খুব খানিক শিশির ঝরবার পর সে বেশ খুশি মনেই আবার হাসি-খেলি করতে লাগল। কতকগুলো বেহায়া তারা ছাড়া অধিকাংশকেই আর দেখা গেল না।

আমার বিজন কুটিরে ফিরে এলুম। চাঁদ উঠেছে, তাই আর প্রদীপ জ্বাললুম না। আর, জ্বালালেও দীপশিখার ঐ ম্লান ধোঁওয়ার রাশটা আমার ঘরের বুকভরা অন্ধকারকে একেবারে তাড়াতে পারবে না। সে থাকবে লুকিয়ে পাতার আড়ালে, ঘরের কোণে, সব জিনিসেরই আড়ালে; ছায়া হয়ে আমাকে মধ্যে রেখে ঘুরবে আমারই চারপাশে। চোখের পাতা পড়তে না পড়তে হড়পা বানের মতো হুপ করে আবার সে এসে পড়বে—যেই একটু সরে যাবে এই দীপশিখাটা!—ওগো আমার অন্ধকার! আর তোমায় তাড়াব না! আজ হতে তুমি আমার সাথী, আমার বন্ধু, আমার ভাই!—বুঝলে ভাই আঁধার, এই আলোটার পেছনে খামখা এতগুলো বছর ঘুরে মরলুম।

আমি বললুম, 'ওগো মেহের-নেগার! আমার তোমাকে চাই-ই! নইলে যে আমি বাঁচব না! তুমি আমার। নইলে এত লোকের মাঝে তোমাকে আমি নিতান্ত আপনার বলে চিনলুম কি করে?—তুমিই তো আমার স্বপ্নে-পাওয়া সাথী!—তুমিই আমার, নিশ্চয়ই আমার!'—চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে সে আমার পানে চাইলে, পলাশ ফুলের মতো ডাগর টানাটানা কাজল-কালো চোখ দুটির গভীর দৃষ্টি দিয়ে আমার পানে চাইলে! কলসিটি-কাঁখে ঐ পথের বাঁকেই অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল সে। তারপর বললে, 'আচ্ছা,—তুমি পাগল!'—আমি ঢোক গিলে একরাশ অশ্রু ভিতর দিকে ঠেলে দিয়ে মাথা দুলিয়ে বললুম, 'হু! তার আঁখির ঘনকৃষ্ণ পল্লবগুলোতে আঁসু উথলে এল! তারপর সে তাড়াতাড়ি চলে যেতে যেতে বললে, 'আচ্ছা, আমি তোমারই!'

একটা অসম্ভব আনন্দের জোর ধাক্কায় আমি অনেকক্ষণ মুষড়ে পড়েছিলুম। চমকে উঠে চেয়ে দেখলুম, সে পাথর বাঁক ফিরে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে।

আমি দৌড়ুতে দৌড়ুতে ডাকলুম, মেহের-নেগার ! সে উত্তর দিল না। কলসিটাকে কাঁখে জড়িয়ে ধরে ডান হাতটাকে তেমনি ঘন ঘন দুলিয়ে সে যাচ্ছিল। তারপর তাদের বাড়ির সিঁড়িতে একটা পা ধুয়ে আমার দিকে তিরস্কারভরা মলিন চাওয়া চেয়ে চলে গেল। আর বলে গেল, 'ছি ! পথে-ঘাটে এমন করে নাম ধরে ডেকো না !—কি মনে করবে লোকে !' পথ না দেখে দৌড়ুতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে একবার পড়ে গেছিলুম, তাতে আমার নাক দিয়ে তখনো ঝরঝর করে খুন ঝরছিল ; আমি সেটা বাঁ-হাত দিয়ে লুকিয়ে বললুম, 'আঃ, তাইতো !—আর অমন করে ডাকব না !'

বুঝলে সখা আঁধার ! যে জন্মান্ধ, তার তত বেশি যাতনা নেই, যত বেশি যাতনা আর দুঃখ হয়—একটা আঘাত পেয়ে যার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে যায়। কেননা, জন্মান্ধ তো কখনো আলোক দেখেনি। কাজেই এ জিনিসটা সে বুঝতে পারে না, আর যে জিনিস সে বুঝতে পারে না তা নিয়ে তার তত মর্মাহত হবারও কোনো কারণ নেই। আর, এই একবার আলো দেখে তারপর তা হতে বঞ্চিত হওয়া,—ওঃ কত বেশি নির্মম নিদারুণ।

তোমায় ছেড়ে চলে যাওয়ার যে প্রতিশোধ নিলে তুমি, তাতে ভাই আঁধার, আর যেন তোমায় ছেড়ে না যাই। তোমায় ছোট ভেবে এই যে দাগা পেলাম বুকে ওঃ তা,—

সেদিন ভোরে ঝিলম নদীর কূলে তার সঙ্গে আবার দেখা হলো। সে আসছিল একা নদীতে স্নান করে। কালো কশকশে ভেজা চুলগুলো আর ফিরোজা রঙের পাৎলা উড়ানিটা ব্যাকুল আবেগে তার দেহ-লতাকে জড়িয়ে ধরেছিল। আকুল কেশের মাঝে সদ্যস্নাত সুন্দর মুখটি তার দিঘির কালোজলে টাটকা ফোটা পদ্মফুলের মতো দেখাচ্ছিল। দূরে একটা জলপাই গাছের তলায় বসে সরল রাখাল বালক গাচ্ছিল,—

'গৌরী ধীরে চলো, গাগরি ছলক নাহি যায়—
শিরোপরি গাগরি, কমর মে ঘড়া,
পাৎরি কমরিয়া তেরি বলখ না যায়, আহা না যায় ;—
গৌরী ধীরে চলো !'

আমিও সেই গানের প্রতিধ্বনি তুলে বললুম, 'ওগো গৌরবর্ণা কিশোরী, একটু ধীরে চলো,—ধীরে !—তোমার ভরা কুম্ভ হতে জল ছলকে পড়বে যে। অত সূক্ষ্ম তোমার কটিদেশ ভরা গাগরি আর ঘড়ার ভারে মুচকে ভেঙে যাবে যে ! ওগো তন্বী গৌরী, ধীরে একটু ধীরে চলো !' আমায় দেখে তার কানের গোড়াটা সিঁদুরের মতো লাল হয়ে উঠল। আমার দিকে শরম-অনুযোগভরা কটাক্ষ হেনে সে বললে, 'ছি ছি, সরে যাও ! একি পাগলামি করছ ?'—আমি ব্যথিত-কণ্ঠে ডাকলুম, মেহের-নেগার ! সে একবার আমার রুক্ষ কেশ, ব্যথাতুর মুখ, ধূলিলিপ্ত দেহ আর ছিন্ন মলিন বসন দেখে কি মনে করে

চুপটি করে দাঁড়াল। তারপর ম্লান হেসে বললে 'ও হলো ! আমার নাম 'মেহের-নেগার' কে বললে?—আচ্ছ, তুমি আমায় ও নামে ডাকো কেন? সে তোমার কে?' আমি দেখলুম, কি একটা ভীতি আর বিস্ময় তার স্বরটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়ে গেল। তার শঙ্কাকুল বুকে ঘন স্পন্দন মূর্ত হয়ে ফুটল। আমারও মনে অমনি বিস্ময় ঘনিয়ে এল। দৃষ্টি ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছিল। তাই তার গায়ে হেলান দিয়ে বললুম, 'আহ ! তুমি তবে সে নও? না—না, তুমি তো সেই আমার—আমার মেহের-নেগার ! অমনি হুবহু মুখ, চোখ,—অমনি ভুরু, অমনি চাউনি, অমনি কথা !—না গো না, আর আমায় প্রতারণা কোরো না। তুমি সেই ! তুমি— !' সে বললে, 'আচ্ছা, মেহের-নেগারকে কোথায় দেখেছিলে?' আমি বললুম, 'কেন, খোওয়াবে !' তার মুখটা এক নিমিষে যেন দপ করে জ্বলে উঠল ! তার সাদা মুখে আবার রক্ত দেখা গেল। সে ঝরনার মতো ঝরঝর করে হাসির ঝরা ঝরিয়ে বললে, 'আচ্ছা, তুমি কবি, না চিত্রকর?' আমি অপ্রতিভ হয়ে বললুম, 'চিত্র ভালোবাসি, তবে চিত্রকর নই। আমি কবিতাও লিখি, কিন্তু কবি নই।' সে এবার হেসে যেন লুটোপুটি খেতে লাগল।

আমি বললুম, 'দেখ, তুমি বড্ডো দুষ্টু !' সে বললে, 'আচ্ছা, আমি আর হাসব না ! তুমি কিসের কবিতা লেখ? আমি বললুম, 'ভালোবাসার' !'

সে ভিজা কাপড়ের একটা কোণ নিঙড়াতে নিঙড়াতে বললে, 'ও তাই,—তা কাকে উদ্দেশ করে?'

আমি সেইখানেই সবুজ ঘাসে বসে পড়ে বললুম, 'তোমাকে—মেহের-নেগার ! তোমাকে উদ্দেশ করে !' আবার তার মুখে যেন কে এক থাবা আবির ছড়িয়ে দিলে। সে কলসিটা কাঁখে আর একবার সামলে নিয়ে বললে, 'তুমি কদ্দিন হতে এরকম কবিতা লিখছ?' আমি বললুম 'যেদিন হতে তোমায় খোওয়াবে দেখেছি !' সে বিস্ময়-পুলকিত নেত্রে আমার দিকে একবার চাইলে, তারপর বললে, 'তুমি এখানে কি করো?' আমি বললুম, 'গান-বাজনা শিখি।' সে বললে, 'কোথায়?' আমি বললুম, 'খাঁ সাহেবের কাছে।' সে খুব উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'একদিন তোমার গান শুনব'খন।—শুনাবে?' তারপর চলে যেতে যেতে পিছন ফিরে বললে, আচ্ছা, তোমার ঘর কোনখানে? আমি বললুম, 'ওয়াজিরিস্থানের পাহাড়।' সে অবাক বিস্ময়ে ডাগর চক্ষু দিয়ে অনেকক্ষণ আমার দিকে চাইলে ; তারপর স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, 'তুমি তাহলে এদেশের নও? এখানে নূতন এসেছ?'—আমি তার চোখে চোখ রেখে বললুম, 'হুঁ,—আমি পরদেশি।' ... সে চুপি চুপি চলে গেল আর একটিও কথা কইল না। ... আমার গলায় তখন বড্ডো বেদনা, কে যেন টুঁটি চেপে ধরেছিল। পেছন হতে ঘাসের শ্যামল বুকে লুটিয়ে পড়ে, আবার ডাকলুম তাকে। কাঁখের কলসি তার টিপ করে ঝরে পড়ে ভেঙে গেল। সে আমার দিকে একটা আর্তদৃষ্টি হেনে বললে, 'আর ডেকো না অমন করে !' দেখলুম তার দুই কপোল দিয়ে বেয়ে চলছে দুইটি দীর্ঘ অশ্রুরেখা !

[খ]

প্রাণপণে চেষ্টা করেও সেদিন সুর-বাহারটার সুর বাঁধতে পারলুম না। আদুরে মেয়ের জেদ-নেওয়ার মতো তার ঝঙ্কারে শুধু একরোখা বেখাপ্পা কান্না ডুকরে উঠছিল। আমার হাতে আমার এই প্রিয় যন্ত্রটি আর কখনো এরূপ অশান্ত অবাধ্য হয়নি, এমন একজিদে কান্নাও কাঁদেনি। আদর-আবদার দিয়ে অনেক করেও মেয়ের কান্না থামাতে না পারলে মা যেমন সেই কাঁদুনে মেয়ের গালে আরো দুতিন থাপপড় বসিয়ে দেয়, আমিও তেমনি করে সুর-বাহারের তারগুলোতে অত্যাচারীর মতো হাত চালাতে লাগলুম। সে নানান রকমের মিশ্রসুরে গোঙানি আরম্ভ করে দিলে!

ওস্তাদজি আঙুর-গালা মদিরার প্রসাদে খুব খোশ-মেজাজে ঘোর দৃষ্টিতে আমার কাণ্ড দেখছিলেন। শেষে হাসতে হাসতে বলেন, 'কি বাচ্চা, তোর তবিয়ত আজ ঠিক নেই,—না! মনের তার ঠিক না থাকলে বীণার তারও ঠিক থাকে না। মন যদি তোর বেসুরা বাজে, তবে যন্ত্রও বেসুরা বাজবে, এ হচ্ছে খুব সাচ্চা আর সহজ কথা।—দে আমি সুর বেঁধে দিই!' ওস্তাদজি বেয়াদব সুর-বাহারটার কান ধরে বার কতক মোলায়েম ধরনের কানুটি দিতেই সে শান্তশিষ্ট ছেলের মতো দিব্যি সুরে এল। সেটা আমার হাতে দিয়ে, সামনের প্লেট হতে দুটো গরম গরম শিক কাবাব ছুরি দিয়ে ছাড়াতে ছাড়াতে তিনি বললেন, 'আচ্ছা, একবার বাগেশ্রী রাগিণীটা আলাপ কর তো বাচ্চা! হাঁ,—আর ও সুরটা ভাঁজবারও সময় হয়ে এসেছে। এখন কত রাত হবে? হাঁ, আর দেখ বাচ্চা, তুই গলায় আর একটু গমক খেলতে চেষ্টা কর, তাহলেই সুন্দর হবে।' কিন্তু সেদিন যেন কণ্ঠ-ভরা বেদনা। সুরকে আমার গোর দিয়ে এসেছিলুম ঐ ঝিলম দরিয়ার তীরের বালুকার তলে। তাই কষ্টে যখন অতিতারের কোমল গান্ধারে উঠলুম তখন আমার কণ্ঠ যেন দীর্ণ হয়ে গেল, আর তা ফেটে বেরুল শুধু কণ্ঠভরা কান্না! ওস্তাদজি দ্রাক্ষারসের নেশায় 'চড় বাচ্চা আর দু'পরদা পঞ্চমে—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে সান্ত্বনা-ভরা স্বরে কইলেন, 'কি হয়েছে আজ তোর বাচ্চা? দে আমায় ওটা।' বাগেশ্রীর ফোঁপিয়ে-ফোঁপিয়ে-কান্না ওস্তাদজির গভীর কণ্ঠ সঞ্চরণ করতে লাগল অনুলোমে বিলোমে—সাধা গলার গমকে মিড়ে! তিনি গাইলেন, 'বীণা-বাদিনীর বীণ আজ আর রোয়ে রোয়ে বনের বুকে মুহুর্মুহু স্পন্দন জাগিয়ে তুলছে না। আঁসু এসে তার কণ্ঠ চেপে ধরেছে। তাই সুর পূর্ণ হয়ে বেরোচ্ছে না। ওগো, তার যে খাদের আর অতিতারের দুইটি তারই ছিন্ন হয়ে গেছে।' আমার তখন ওদিকে মন ছিল না। আমার মন প'ড়েছিল সেই আমার স্বপ্নে-পাওয়া তরুণীটির কাছে।

ওঃ, সে স্বপ্নের চিন্তাটা এত বেশি তীব্র মধুর, তাতে এত বেশি মিঠা উন্মাদনা যে দিনে হাজার বার মনে করেও আমার আর তৃপ্তি হচ্ছে না। সে কি অতৃপ্তির কন্টক বিঁধে গেল আমার মর্মতলে, ওগো আমার স্বপ্ন-দেবী! ওই কাঁটা যে হৃদয়ে বিঁধেছে, সেইটেই এখন থেকে সারাবুক বেদনায় টনটন করছে। ওগো আমার স্বপ্নলোকের ঘুমের দেশের

রানি। তোমার সে আকাশ ঘেঁশা ফুল, আর পরাগ-পরিমলে-ভরা দেশ কোথায়? সে জ্যোৎস্না-দীপ্ত কুটির যেখানে পায়ের আলতা তোমার রক্তরাগে পাতার বুকে ছোপ দিয়ে যায়, সে কুটির কোন নিকুঞ্জের আড়ালে, কোন তড়াগের তরঙ্গ-মর্মরিত তীরে?

সে স্বপ্নচিত্রটা কি সুন্দর :—

সেদিন সাঁঝে অনেকক্ষণ কুস্তি করে খুব ক্লান্ত হয়ে যেমনি বিছানায় গা দিয়েছি, অমনি যেন রাজ্যের ঘুম এসে, আমার সারা দেহটাকে নিষ্কম্প অলস করে ফেললে, আমার চোখের পাতায় পাতায় তার সোহাগ-ভরা ছোঁওয়ার আবেশ দিয়ে। শীঘ্রই আমার চেতনা লুপ্ত করে দিলে সে যেন কার শিউরে-ওঠা কোমল অধরের উন্মাদনা ভরা চুম্বন-মদিরা! ... হঠাৎ আমি চমকে উঠলুম। ... কে এসে আমার দুইটি চোখেই স্নিগ্ধ কাজল বুলিয়ে দিলে! দেখলুম, যেখানে আসমান আর দরিয়া চুমোচুমি করছে, সেইখানে একটি কিশোরী বীণা বাজাচ্ছে; বরফের ওপর পূর্ণ-চাঁদের চাঁদনি পড়লে যেমন সুন্দর দেখায়, তাকে তেমনি দেখাচ্ছিল, সূক্ষ্ম রেশমি নীল পেশোয়াজের শাসন টুটে বীণাবাদিনীর কৈশোর-মাধুর্য ফুটে বেরুচ্ছিল—আসমানের গোলাবি নীলিমায় জড়িত প্রভাত অরুণশ্রীর মতো মহিমশ্রী হয়ে। সে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকলে। আমার চোখের ঘুমের রঙিন কুয়াশা মসলিনের মতো একটা ফিনফিনে পরদা টেনে দিলে। বীণার চেয়েও মধুর বীণাবাদিনীর মঞ্জু গুঞ্জন প্রেয়সীর কানে-কানে-কওয়া গোপন কথার মতো আমায় কয়ে গেল, 'ঐ যে চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করছে দরিয়ার কিনার, ঐখানে আমার ঘর। ঐখানে আমি বীণ বাজাই। তোমার ঐ সরল বাঁশির সহজ সুর আমার বুকে বেদনার মতো বেজেছে, তাই এসেছি! আবার আমাদের দেখা হবে সূর্যাস্তের বিদায়-ম্লান শেষ-আলোক-তলে। আর মিলন হবে এই উদার আকাশের কোলে এমনি এক অরুণ-অরুণিমা-রক্ত নিশি-ভোরে—যখন বিদায় বাঁশির ললিত বিভাসের কান্না তরল হয়ে ঝরে পড়বে।' আমি আবিষ্টের মতো তার আঁচল ধরে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে তুমি, স্বপ্নরানি?' সে বললে, 'আমায় চিনতে পারলে না, য়ুসোফ? আমি তোমারই মেহের-নেগার!' ... অচিন্ত্য অপূর্ব অনেক-কিছু পাওয়ার আনন্দে আমার বুক ভরে উঠেছিল। আমি রুদ্ধকণ্ঠে কইলুম, 'তুমি আমায় কি করে চিনলে?—হাঁ, আমি তোমাকেই চাইছিলুম—তবে তোমার নাম জানতুম না। আর তোমায় নাকি অনেকেই জীবনের এমনি ফাগুন-দিনে ডাকে? তবে শুধু কি আমায়ই দেখা দিলে, আর কাউকে না?' সে তার তাম্বুলরাগ-রক্ত পাপড়ির মতো পাৎলা ঠোঁট উলটিয়ে বললে, 'না—আমি তোমায় কি করে চিনব?—এই হালকা হাওয়ায় ভেসে আমি সব জায়গাতেই বেড়াই; কাল সাঁঝে তাই এদিক দিয়ে পেরিয়ে যেতে যেতে শুনলুম তুমি আমায় বাঁশির সুরে কামনা করছ! তাই তোমায় দেখা দিলুম। ... আর, হাঁ—যারা তোমার মতো এমনি বয়সে এমনি করে তাদের অজানা অচেনা প্রেয়সীর জন্য কেঁদে মরে, কেবল তাকেই দেখা দিয়ে যাই। ... তবু আমি তোমারই!' ... মেঘের কোলে সে কিশোরীর কম-মূর্তি ঝাপসা হয়ে এল।

আমার ঘুম ভাঙল। কোকিল ডাকলে, 'উ—হু—উ!' পাপিয়া শুধালে, 'পিউ কাহাঁ?' বুলবুল ঝুঁটি দুলিয়ে গলা ফুলিয়ে বললে, 'জা—নি-নে।' ঝরা-হেনার-শেষ সুবাস আর পীত-পরাগ-লিপ্ত ভোরের বাতাস আমার কানের কাছে শ্বাস ফেলে গেল, 'হু—হু—হু!'

[গ]

আমার স্নেহের বাঁধনগুলো জোর বাতাসে পালের দীর্ণ দড়ির মতো পট পট করে ছিঁড়ে গেল। তারপর ঢেউ-এর মুখে ভাসতে ভাসতে, খাপছাড়া'—ঘরছাড়া আমি এই ঝিলমে এলুম!—প্রথম দেখলুম এই হিন্দুস্থানের বীরের দেশ প্যাঁচটা দরিয়ার তরঙ্গ-সঙ্কুল পাঞ্জাব, যেখানের প্রতি বালুকণা বীরের বুকের রক্ত জড়ানো—যেখানের লোকের তৃষ্ণা মিটাত দেশদ্রোহী—আর দেশ-শত্রু 'জিগরের খুন।'

* * *

যে ডাল ধরতে গেলুম, তাই ভেঙে আমার মাথায় পড়ল! তাই নিরাশ্রয়ের কুটো ধরার মতো অকেজোর কাজ এই সঙ্গতকেই আশ্রয় করলুম আমার কাজ আর সান্ত্বনা স্বরূপে!

ওঃ, আমার এই বলিষ্ঠ মাংসপেশীবহুল শরীর, মায়া-মমতাহীন—লৌহ কবাটের মতো শক্ত বক্ষ, তাকে আমি চেষ্টা করেও উপযুক্ত ভালো কাজে লাগাতে পারলুম না, খোদা! দেশের মঙ্গলের জন্য এর ক্ষয় হলো না!—প্রিয় ওয়াজিরিস্তানের পাহাড় আমার! তোমার দেহটাকে অক্ষত রাখতে গিয়ে যদি আমার এই বুকের উপর তোমারি অনেকগুলো পাথর পড়ে পাঁজরাগুলো গুঁড়ো করে দিত, তা'হলে সে কত সুখের মরণ হতো আমার! ওই তো হতো আমার হতভাগ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা!—আমার জন্যে কেউ কাঁদবার নেই বলে হয়তো তাতে মানুষ কেউ কাঁদত না, কিন্তু তোমার পাথরে—মরুতে—উষ্ণ মারুতে শুকনো শাখায় একটা আকুল অব্যক্ত কম্পন উঠত! সেই তো দিত আত্মায় আমার পূর্ণ তৃপ্তি! আহ্, এমন দিন কি আসবে না জীবনে!

আচ্ছা,—ওগো অলক্ষ্যের মহান স্রষ্টা! তোমার সৃষ্ট পদার্থে এত মধুর জটিলতা কেন? পাহাড়ের পাথরবুকে নির্ঝরের স্রোত বইছে, আর আমাদের মতো পাষাণের বুকেও প্রেমের ফল্গুধারা লুকিয়ে রেখেছ! ... আর তুমি যদি ভালোবাসাই সৃষ্টি করলে, তবে আলোর নিচে ছায়ার মতো তার আড়ালে নিরাশাকে গোপন রাখলে কেন?

আমাকে সবচেয়ে ব্যথিয়ে তুলছে গত সন্ধ্যার কথাটা!—

আবার সহসা তার সঙ্গে দেখা হলো সন্ধেবেলার খানিক আগে। তখন ঝিলমের তীরে তীরে ঝিঁঝি পোকার ঝিঁঝিট রাগিণীর ঝমঝমানি ভরে উঠছিল। সে ঠিক সেই স্বপ্নে-দেখা কিশোরীর মতোই হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকলে, 'এখানে এস!' ... আমি

শুধোলুম, 'মেহের-নেগার, স্বপ্নের কথা কি সত্যি হয়?' সে বললে, 'কেন?' আমি তাকে আমার সেই স্বপ্নের কথা জানিয়ে বললুম, 'তুমিই তো সেদিন নিশি-ভোরে আমায় অমন করে দেখা দিয়ে এসেছিলে আর তোমার নামও বলে এসেছিলে! ... তুমি যে আমার!' একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বয়ে গেল তার বুকের বসনে দোল দিয়ে! সে বললে, 'য়ুসোফ, আমি তো মেহের-নেগার নই, আমি—গুলশন!' সে কেঁদে ফেললে। ... আমি বললুম, 'তা হোক, তুমিই সেই! ... আমি তোমাকে মেহের-নেগার বলেই ডাকব।' সে বললে, 'এস, সেদিন গান শুনাবে বলেছিলে না?' আমি বললুম, 'তুমিই গাও, আমি শুনি।' সে গাইলে,—

'ফারাকে জানাঁ মে হামনে সাকি লোহু পিয়া হেয় শারাব করকে
তপে আলম নে জেগর কো ভুনা উয়ো হামনে খায়া কবাব করকে॥'

আহ্! এ কোন দগ্ধহৃদয়ের ছটফটানি?—প্রিয়তমের বিচ্ছেদে আমার নিজের খুনকেই শরাবের মতো করে পান করেছি, আর ব্যথার তাপে আমার হৃৎপিণ্ডটাকে পুড়িয়ে কাবাব করে খেয়েছি।—ওগো সাকি, আর কেন? এসরাজের ঝঙ্কার থামাতে অনেক সময় লাগল।

আমি গাইলুম, 'ওগো, সে যদি আমার কথা শুধায়, তবে বলো যে, সারা জনম অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে সে আজ বেহেশতের বাইরে তোমারই প্রতীক্ষায় বসে আছে!' সে কেঁদে আমার মুখটা চেপে ধরে বললে, 'না—না, এমন গান গাইতে নেই!' তারপর বললে, 'আচ্ছা, এই গান-বাজনায় তোমার খুব আনন্দ হয়, —না?' আবার সে কোন অজানা-নিষ্ঠুরের প্রতি অভিমানে আমার বক্ষে ক্রন্দন গুমরে উঠল! আমি গাইলুম—

'শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে?
অশান্তি যে আঘাত করে তাইতে বীণা বাজে!
নিত্য রবে প্রাণ-পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা,
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ ঢালা।'

বিদায়ের ক্ষণে সে হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলে বললে, 'আচ্ছা, তুমি আমায় ভালোবাস, তাই আমি একটা ভিক্ষা চাইছি।.. বলো, আর আমায় ভালোবাসবে না, আমায় চাইবে না।' সে উপুড় হয়ে আমার পায়ে পড়ল। ... চাঁদের সমস্ত আলো এক লহমায় নিবে গেল বিরাট একটা জলোমেঘের কালো ছায়ার আড়ালে পড়ে! ... আমি কষ্টে উচ্চারণ করতে পারলুম, 'কেন?' সে একটু থেমে, চোখ দুটো আঁচল দিয়ে চেপে বললে, 'দেখো, পবিত্র জিনিসের পূজা পবিত্র জিনিস দিয়েই হয়। কলুষ যা, তা দিয়ে পূতকে পেতে গেলে পূজারীর পাপের মাত্রা চরমে গিয়ে পৌঁছে। ... এই যে তোমার ভালোবাসা,—হোক না তা মাদকতা আর উন্মাদনার তীব্রতায় ভরা,—তা অকৃত্রিম আর প্রগাঢ় পবিত্র! তাকে অবমাননা করতে আমার যে একবিন্দু সামর্থ্য নেই। ... আমাকে চেনো না? এই শহরে যে খুরশেদজান বাইজির নাম শুন, আমি তারই মেয়ে।' বলেই সে সোজা হয়ে

দাঁড়াল, তার সারা অঙ্গ কাঁপতে লাগল ! সে বললে, 'রূপজীবিনীর কন্যা আমি, ঘৃণ্য, অপবিত্র। ওগো আমার শিরায়-শিরায় যে অপবিত্র পঙ্কিল রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে ! কেটে দেখো, সে লোহু রক্তবর্ণ নয়, বিষ-জর্জরিত মুমূর্ষুর মতো তা নীল-সিয়াহ্।' দেখলুম, তার চোখ দিয়ে আগুনের ফিনকির মতো জ্বালাময়ী অশ্রু নির্গত হচ্ছে। বুঝলুম, এ তো স্নিগ্ধ গৈরিক নির্ঝর নয়, এ যে আগ্নেয়-গিরির উত্তপ্ত দ্রবময়ী স্রোতের বিপুল নিঃস্রাব !

বিছার কামড়ের মতো কেমন একটা দংশন-জ্বালা বুকের অন্তরতম কোণে অনুভব করলুম। ভাবলুম স্বভাব-দুর্গন্ধ যে ফুল, সে দোষ তো সে ফুলের নয়। সে দোষ যদি দোষ হয়, তবে তা স্রষ্টার। অথচ তার বুকেও যে সুবাস আছে, তা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারে অসাধারণ যে, সে-ই ; সাধারণে কিন্তু তার নিকটে গেলেই মুখে কাপড় দেয়, নাক সিঁটকায়। ... আমি ছিন্নকণ্ঠ বিহগের মতো আহত স্বরে বললুম, 'তা—তা হোক, মেহের-নেগার ! সে দোষ তো তোমার নয়। তুমি ইচ্ছা করলে কি পবিত্র পথে চলতে পারো না ? স্রষ্টার সৃষ্টিতে তো তেমন অবিচার নেই। আর বোধ হয় এমনই ভাগ্যহত যারা তাদের প্রতিই তাঁর করুণা, অন্তত সহানুভূতির একটু বেশি পরিমাণেই পড়ে, এ যে আমরা না ভেবেই পারিনে ! ... আর তুমি তো আমায় সত্য করে ভালোবেসেছ ! এ ভালোবাসায় যে কৃত্রিমতা নেই, তা আমি যে আমার হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারছি। আর এ প্রেমের আসল নকল দুটি হৃদয় ছাড়া সারা বিশ্বের কেউ বুঝতে পারবে না। ... হাঁ, আর ভালোবাসায় জীব যখন কাঁদতে পারে, তখন সে অনেক উঁচুতে উঠে যায়। নিচের লোকেরা ভাবে, 'এ লোকটার অধঃপতন নিশ্চিত।' অবশ্য একটু পা পিছলে গেলেই যে সে অত উঁচু হতে একেবারে পাতালে এসে পড়বে, তা সেও বোঝে। তাই সে কারু কথা না শুনে সাবধানে অমনি উঁচুতেই উঠতে থাকে। ... না মেহের-নেগার, তোমাকে আমার হতেই হবে।' ... সে স্থির হয়ে বসল, তারপর মূর্ছাতুরের মতো অস্পষ্ট কণ্ঠে কইলে, 'ঠিই বলেছ য়ুসোফ, আমার সামনে অনেকেই এল, অনেকেই ডাকল ; কিন্তু আমি কোনদিন তো এমন করে কাঁদিনি। যে আমার সামনে এসে তার ভরা অর্ঘ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে, মনে হতো আহা, একেই ভালোবাসি। এখন দেখছি, তা ভুল। সময় সময় যে অমন হয়, আজ বুঝেছি তা ক্ষণিকের মোহ আর প্রবৃত্তির বাইরের উত্তেজনা। কিন্তু যেদিন তুমি এসে বললে, তুমি আমারই, সে দিন আমার প্রাণমন সব কেন একযোগে সাড়া দিয়ে উঠল, 'হাঁগো হাঁ, আমার সব তোমারই। ওঃ, সে কি অনাবিল গভীর প্রশান্ত প্রীতির জোয়ার ছুটে গেল ধমনীর প্রতি রক্ত-কণিকায় ! সে এমন একটা মধুর সুন্দর ভাব, যা মানুষ জীবনে একবার মাত্র পেয়ে থাকে,—সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে ! আমাদের এই ভালোবাসায় আর দরবেশের প্রেমের সমান গভীরতা, এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, যদি সেই ভালোবাসা চিরন্তন হয়।' .. ক্লান্ত কান্তার মতো সে আমার স্কন্ধে মাথাটা ভর করে আস্তে আস্তে কইলে, 'তোমাকে পেয়েও যে এই আমি তোমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি, এ তোমাকে ভালোবাসতে,—প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পেরেছি বলেই ! ... আমার—আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে য়ুসোফ, তবে তোমাকে পাবার আশা আমাকে জোর করে ত্যাগ করতেই হবে। যাকে ভালোবাসি তারই অপমান তো করতে পারিনে

আমি! এইটুকু ত্যাগ, এ আমি খুব সইতে পারব। অভাগিনী নারী জাতি আমাদের এর চেয়েও যে অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তোমরা যাই-ইভাবো, আমাদের কাছে এ কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়, আর কঠিনও নয়।... ওঃ, কেন তুমি আমার পথে এলে? কেন তোমার শুভ্র শুচি প্রেমের সোনার কাঠির পরশ দিয়ে আমার অ-জাগন্ত ভালোবাসা জাগিয়ে দিলে?—না, তোমাকে না পেলেও তুমি থাকবে আমারই। তবু আমাদের দুজনকে দুদিকে সরে যেতে হবে।—যে বুকে প্রেম আছে, সেই বুকেই কামনা ওৎ পেতে বসে আছে। আমাদের নারীর মনকে বিশ্বাস নেই য়ুসোফ, সে যে বড়ই কোমল, সময়ে একটু তাপেই গলে পড়ে। কে জানে এমন করে থাকলে কোন দিন আমাদের এই উঁচু জায়গা হতে অধঃপতন হবে।... না, না প্রিয়তম, আর এই কলুষবাষ্পে তোমার স্বচ্ছ দর্পণ ঝাপসা করে তুলব না।... আর হয়তো আমাদের দেখা হবে না। যদি হয়, তবে আমাদের মিলন হবে ঐ—ঐখানে যেখানে আকাশ আর দরিয়া দুই উদার অসীমে কোলাকুলি করছে!... বিদায় প্রিয়তম! বিদায়!' বলেই সে আমার হস্ত চুম্বন করে উন্মাদিনীর মতো ছুটে বেরিয়ে গেল।

ঝড় বইছিল শন—শন—শন। আর অদূরের বেণুবনে আহত হয়ে তারই কান্না শোনা যাচ্ছিল আহ্—উহ্—আহ্! স্নায়ু ছিন্ন হওয়ার মতো কট কট করে বেদনার্ত বাঁশগুলোর গিঁঠে গিঁঠে শব্দ হচ্ছিল।

এক বুক ব্যথা নিয়ে ফিরে এলুম! ফিরতে ফিরতে চোখের জলে আমার মনে পড়ল—সেই আমার স্বপ্নরানির শেষ কথা! সেও তো এর মতোই বলেছিল, 'আমাদের মিলন হবে এই উদার আকাশের কোলে এমনি এক তরুণ অরুণিমা-রক্ত-নিশিভোরে যখন বিদায় বাঁশির সুরে সুরে ললিত বিভাসের কান্না তরল হয়ে ক্ষরবে!'

[ঘ]

সেদিন যখন আমায় একেবারে বিস্ময়-পুলকিত আর চকিত করে সহসা আমার জন্মভূমি-জননী আমার বুকের রক্ত চাইলে, তখন আমার প্রাণ যে কেমন ছটফট করে উঠলে তা কইতে পারব না!... শুনলুম আমাদের স্বাধীন পাহাড়িয়া জাতিটার উপর ইংরেজ আর কাবুলের আমির দুজনারই লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে। আর কয়েকজন দেশদ্রোহী শয়তান দুভাগে বিভক্ত হয়ে দেশটাকে অন্যের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছে। তারা ভুলে যাচ্ছে যে, আমাদের এই ঘরবাড়িহীন পাঠানদের বশে আনতে কেউ কখনো পারবে না। আমরা স্বাধীন—মুক্ত। সে যেই হোক না কেন, আমরা কেন তার অধীনতা স্বীকার করতে যাব? শিকল সোনার হলেও তা শিকল।—না, না, যতক্ষণ এই য়ুসোফ খাঁর এক বিন্দু রক্ত থাকবে গায়ে আর মাথাটা ধড়ের সঙ্গে লাগা থাকবে, ততক্ষণ কেউ, কোনো অত্যাচারী সম্রাট আমার জন্মভূমির এক কণা বালুকাও স্পর্শ করতে পারবে না! ওঃ একি দুনিয়াভরা অবিচার আর অত্যাচার, খোদা তোমার এই মুক্ত

সাম্রাজ্যে? এইসব ছোট মনের লোকই আবার নিজের 'উচ্চ' 'মহান' 'বড়' বলে নিজেদের ঢাক পিটায়।—ওঃ যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের অবস্থা কেমন হবে যেমন আকাশের অনেকগুলো পাখিকে ধরে এনে চারিদিকে লোহার শিক দেওয়া একটা খাঁচার ভিতর পুরে দিলে হয়। ওঃ আমার সমস্ত স্নায়ু আর মাংসপেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। আরো শুনছি দুইপক্ষেই আমাদিগকে রীতিমতো ভয় দেখানো হচ্ছে।—হাঃ হাঃ হাঃ! গাছের পাখিগুলোকে বন্দুক দেখিয়ে শিকারী যদি বলে, 'সব এসে আমার হাতে ধরা দেও, নইলে গুলি ছাড়লুম!' তাহলে কি পাখিরা এসে তার হাতে ধরা দেবে? কখনোই না, তারা মরবে, তবুও ধরা দেবে না—দেবে না! এ শিকারীদের বুকে যে ছুরি লুকানো আছে, তা পাখিরা আপনিই বোঝে। এ তাদের শিখিয়ে দিতে হয় না। হাঁ, আর যদিই যোগ দিতে হয়, তবে নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে যেখানে অন্যায় দেখব সেইখানেই আমাদের বজ্রমুষ্টির ভীম তরবারির আঘাত পড়বে। আমার জন্মভূমি কোনো বিজয়ীর চরণ স্পর্শে কখনো কলঙ্কিত হয়নি, আর হবেও না। 'শির দিব, তবু স্বাধীনতা দিব না।'

তোমার পবিত্র নামের শপথ করে এই যে তরবারি ধরলুম খোদা, এ আর আমার হাত হতে খসবে না! তুমি বাহুতে শক্তি দাও!—এই তরবারির তৃষ্ণা মিটাব—প্রথমে দেশদ্রোহী শয়তানদের জিগরের খুনে, তারপর দেশ-শত্রুর কলুষরক্তে।—আমিন!!!

* * *

হাঁ, আমার মনে হচ্ছে হয়তো আমার দেশের ভাই-ই আমায় হত্যা করবে জল্লাদ হয়ে! ... তা হোক, তবুও সুখে মরতে পারব, কেননা আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ দেশের পায়েই উৎসর্গীকৃত হবে!—'খোদা! আমার এ দান যেন তুমি কবুল করো।'

* * *

বেশ হয়েছে! খুব হয়েছে!! আচ্ছা হয়েছে!!!

আমার এই চিরবিদায়ের সময় কেন কাল মনে হলো, সে অভাগীকে একবার দেখে যাই। কেন সে ইচ্ছাকে কিছুতেই দমন করতে পারলুম না। ... গিয়ে দেখলুম তার ত্যক্ত বাড়িটা ধুলি আর জঙ্গলময় হয়ে সদ্যবিধবা নারীর মতো হাহাকার করছে! ... আর—আর ও কি? ... ঘরের আঙ্গিনায় ও কার কবর? যেন কার একবুক বেদনা উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। কার পাহাড়পারা ব্যথা জমাট হয়ে যেন মূর্ছিত হয়ে মাটি আঁকড়ে রয়েছে। ... কবরের শিরানে কার বুকের রক্ত দিয়ে মর্মরফলকে লেখা, 'অপবিত্র জঠরে জন্ম নিলেও ওগো পথিক, আমায় ঘৃণা করো না! একবিন্দু অশ্রু ফেলো, আমার কল্যাণ কামনা করে—আমি অপবিত্র কি-না জানি না, কিন্তু পবিত্র ভালোবাসা আমার এই বুকে তার পরশ দিয়েছিল! ... আর ওগো স্বামিন! তুমি যদি কখনো এখানে আস,—আঃ, তা আসবেই—তবে আমায় মনে করে কেঁদো না। যেখানেই থাকি প্রিয়তম, আমাদের মিলন হবেই। এমন আকুল প্রতীক্ষার শেষ অবসান এই দুনিয়াতেই হতে পারে না! খোদা নিজে যে প্রেমময়!—অভাগিনী—গুলশন!'

আমার এক বুক অশ্রু ঝরে মর্মর-ফলকের মলিন রক্ত লেখাগুলিকে আরো অরুণোজ্জ্বল করে দিলে। ...

ঝিলমের ওপার হতে কার আর্ত আর্দ্র সুর এপারে এসে আছাড় খাচ্ছিল,

'আগর, মেয় বাগবাঁ হোতে তো গুলশন কো লুটা দেতে।
পাকড় কর দস্তে বুলবুল কো চমন সে জাঁ মেলা দেতে॥'

হায়রে অবোধ গায়ক! তুই যদি মালি হতিস, তাহলে বুলবুলের হাত ধরে ফুলের সঙ্গে মিলন করিয়ে দিতিস—অসম্ভব রে, তা অসম্ভব। খোদা হয়তো তোকে সে শক্তি দেননি, কিন্তু যাদের সে শক্তি আছে ভাই, তাঁরা তো কই এমন করা তো দূরের কথা, একবার তোর এই কথা মুখেও আনতে পারে না। তোরই এই ক্ষমতা থাকলে হয়তো তুই এ গান গাইতে পারতিস নে! ...

* * *

তবু আমার চিরবিদায়ের দিনে ঐ গানটা বড্ডো মর্মস্পর্শী মধুর লেগেছিল।

সাঁঝের তারা

সাঁঝের তারার সাথে যেদিন আমার নতুন করে চেনা-শোনা, সে এক বড় মজার ঘটনা।

আরব-সাগরের বেলার ওপরে একটি ছোট্ট পাহাড়। তার বুক রঙ্‌বেরঙ্‌-এর শাঁখের হাড়ে ভরা। দেখে মনে হয়, এটা বুঝি একটা শঙ্খ-সমাধি। তাদেরই ওপর একলা পা ছড়িয়ে বসে যে কথা ভাবছিলাম সে কথা কখনো বাজে উদাস পথিকের কাঁপা গলায়, কখনো শুনি প্রিয়-হারা ঘুঘুর উদাস ডাকে ; আর ব্যথাহত কবির ভাষায় কখনো কখনো তার আচমকা একটি কথা-হারা কথা—উড়ে-চলা পাখির মিলিয়ে-আসা ডাকের মতো শোনায়।

সেদিন পথ-চলার নিবিড় শ্রান্তি যেন আমার অণুপরমাণুতে আলস-ছোঁওয়া বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। ঘুমের দেশের রাজকুমারী আমার রুখু চুলের গোছাগুলি তার রজনীগন্ধার কুঁড়ির মতো আঙুল দিয়ে চোখের ওপর হতে তুলে দিতে দিতে বললে, 'লক্ষ্মীটি এবার ঘুমোও !' বলেই সে তার বুকের কাছটিতে কোলের ওপর আমার ক্লান্ত মাথাটি তুলে নিলে। তার সইদের কণ্ঠে আর বীণায় সুর উঠছিল—

'অশ্রু-নদীর সুদূর পারে
ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে।'

আমার পরশ-হরষে সদ্য-বিধবার কাঁদনের মতো একটা আহত-ব্যথা টোল খাইয়ে গেল। আমি ঘুম-জড়ানো কণ্ঠে কণ্ঠ-ভরা মিনতি এনে বললাম, 'আবার ঐটে গাইতে বলো না ভাই !' গানের সুরের পিছু পিছু আমার পিপাসিত চিত্ত হাওয়ার পারে কোন দিশেহারা উত্তরে ছুটে চলল। তারপর ... কেউ কোথাও নেই। একা—একা—শুধু একা ! ওগো কোথায় আমার অশ্রু-নদী ? কোথায় তার সুদূর পার ? কোথায় বা তার ঘাট, আর সে কার দ্বারে ? দিকহীন দিগন্ত সারা বিশ্বের অশ্রুর অতলতা নিয়ে আরেক সীমাহারার পানে মৌন ইঙ্গিত করতে লাগল,—'ঐ—ঐ দিকে গো ঐ দিকে !' ... হায় ? কোথায় কোন দিকে কে কী ইঙ্গিত করে ?

অলস-আঁখির উদাস-চাওয়া আমার সারা অঙ্গে বুলিয়ে মলিন কণ্ঠে কে এসে বিদায়-ডাক দিলে,—'পথিক ওঠো ! আমার যাবার সময় হয়ে এল।' আমি ঘুমের দেশের বাদশাজাদির পেশোয়াজ-প্রান্ত দু-হাত দিয়ে মুঠি করে ধরে বললাম, 'না, না, এখনো তো আমার ওঠবার সময় হয়নি। ... কে তুমি ভাই ? তোমার সবকিছুতে এত উদাস কান্না ফুটে উঠচে কেন ?' তার গলার আওয়াজ একদম জড়িয়ে গেল। ভেজা কণ্ঠে সে বললে, 'আমার নাম শ্রান্তি, আজ আমি তোমায় বড্ডো নিবিড় করে পেয়েছিলাম। ... এখন আমি যাই, তুমি ওঠো। আয় সই ঘুম, ওকে ছেড়ে দে !'

জেগে দেখি, কেউ কোথাও নেই, আমি একা। তখন সাঁঝের রানির কালো ময়ূরপঙ্খী ডিঙিখানা ধূলি-মলিন পাল উড়িয়ে সাগর বুকে নেমেছে। ... জানটা কেমন উদাস হয়ে গেল। ... যারা আমার সুপ্তির মাঝে এমন করে জড়িয়ে ছিল, তাদের চেতনার মাঝে হারালাম না। কেন? এই জাগরণের একা-জীবন কী দুর্বিষহ বেদনার ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত, কী নিষ্করুণ শুষ্কতা তিক্ততায় ভরা! সেইদিন বুঝলাম, কত কষ্টে ক্লান্ত পথিকের ব্যর্থ সন্ধ্যা-পথে উদাস পূরবীর অলস ক্রন্দন এলিয়ে এলিয়ে যায়—

'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে,
শূন্য ঘাটে একা আমি,
পার করে নাও খেয়ার নেয়ে!'

হায়রে উদাসীন পথিক! তোর সব ব্যর্থ ভাই, সব ব্যর্থ! কোথায় খেয়ার নেয়ে ভাই? কোন অচিন মাঝিকে এমন বুক-ফাটা ডাক ডাকিস তুই? কোথায় সে? কার পথ চেয়ে তোর বেলা গেল? কে সে তোর জন্ম-জন্ম ধরে-চাওয়া না-পাওয়া ধন? কোন ঘাটে তুই একা বসে এই সুরের জাল বুনছিস? এ ঘাটে কি কোনোদিন সে তার কলসিটি-কাঁখে চলতে গিয়ে দুহাতে ঘোমটা ফাঁক করে তোর মুখে চোখে বধূর আধখানা পুলক-চাওয়া থুয়ে গিয়েছিল? না—কি—সে তার কমল-পায়ের জল-ভেজা পদচিহ্ন দিয়ে তোর পথের বুকে স্মৃতির আলপনা কেটে গিয়েছিল? কখনো কাউকে জীবন ভরে পেলিনে বলেই কি তোর এত কষ্ট ভাই? হায় ও-পারের যাত্রী, তোমার সেই 'কবে-কখন একটুখানি-পাওয়া' হৃদয়-লক্ষ্মীর চরণ-ছোঁওয়া একটি ধূলি-কণাও আজ তোমার জন্যে পড়ে নেই! বৃথাই সে রেণু-পরিমল পথে পথে খোঁজা ভাই, বৃথা-বৃথা!

অবুঝ মন ওসব কিচ্ছু শুনতে চায় না, বুঝতে চায় না। তার মুখে খ্যাপা মনসুরের একটি কথা 'আনল হক'-এর মতো যুগ-যুগান্তের ওই একই অতৃপ্ত শোর উঠছে, 'হায় হারানো লক্ষ্মী আমার! হায় আমার হারানো লক্ষ্মী!'

ঘুমিয়ে বরং থাকি ভালো! তখন যে আমি স্বপনের মাঝে আমার না-পাওয়া লক্ষ্মীকে হাজার বার হাজার রকমে পাই। তাকে এই যে জাগরণের মধ্যে পাবার একটা বিপুল আকাঙ্ক্ষা,—বুকে বুকে মুখে মুখে চেপে নিতে, সেই তার উষ্ণ-পাওয়াকে আমি ঘুমের দেশে স্বপনের বাগিচায় বড় নিবিড় করেই পাই। মানুষের মন মস্ত প্রহেলিকা। মন নিক্তির মতন যখন যেদিকে ভার বেশি পায়, সেই দিকেই নুয়ে পড়ে। তাই কখনো মনে করি পাওয়াটাই বড়, পাওয়াতেই সার্থকতা। আবার পরক্ষণেই মনে হয়, না—না-পাওয়াটাই পাওয়া, ওই না-পাওয়াতেই সকল পাওয়া সুপ্ত রয়েছে। এ সমস্যার আর মীমাংসা হলো না। অথচ দুই পথেরই লক্ষ্য এক। দুই স্রোতেরই লক্ষ্য সাগর-প্রিয়ার সীমাহারা বুকে নিজের সমস্ত বেগ সমস্ত গতি সমস্ত স্রোত একেবারে শেষ করে ঢেলে দেওয়া, তারপর নিজের অস্তিত্ব ভুলে যাওয়া—শুধু এক আর এক! কিন্তু এই 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর' কথাটার এমন একটা নেশা আর মাদকতা রয়েছে, যেটা অনবরত আমার মনের কামনা-কিশোরীকে শিউরিয়ে তুলছে এবং বলছে, 'বন্ধনেই মুক্তি'—এই যে মানব-মনের চিরন্তনী বাণী, সেটা কি মিথ্যা? না, এ সমস্যার সমাধান নেই।

আবার মনটা গুলিয়ে যাচ্ছে।

আমার মনের ভোগ আর বৈরাগ্যের একটা নিষ্পত্তিও হলো না আর তাই কাউকে জীবন ভরে পাওয়াও হলো না!

তবে?...

কাউকে না পেয়েও আমার মনে এ কোন আদিম-বিরহী ভুবন-ভরা বিচ্ছেদ-ব্যথায় বুক পুরে মুলুকে মুলুকে ছুটে বেড়াচ্ছে? খ্যাপার পরশ-মণি খোঁজার মতন আমিও কোন পরশ-মণির ছোঁওয়া পেতে দিকে দিকে দেশে দেশে ঘুরে মরছি? কোন লক্ষ্মীর আঁচল-প্রান্তে বাঁধা রয়েছে সে মানিক? কোন তরুণীর গলায় রক্ষা-কবচ হয়ে ঝুলছে সে পাথর?

ভাবতে ভাবতে চোখে জল গড়িয়ে এল। সেই জলবিন্দুতে সহসা কার দুষ্টু হাসির চপল কিরণ ছলছলিয়ে উঠল। আমি চমকে সামনে চোখ চাইতেই দেখলাম, আকাশের মুক্ত আঙিনায় ললাটের আধফালি ঘোমটায় ঢেকে প্রদীপ-হাতে সাঁঝের তারা দাঁড়িয়ে। তার চোখের কিনারায়, মুখের রেখায়, অধরপুটের কোণে কোণে দুষ্টুমির হাসি লুকোচুরি খেলছে। বারেবারে-উছলে-ওঠা নিলাজ হাসি ঠোঁটের কাঁপন দিয়ে লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টায় তার হাতের মঙ্গল-প্রদীপ কেঁপে কেঁপে লোলুপ শিখা বাড়িয়ে সুন্দরীর রাঙা গালে উষ্ণ চুম্বন এঁকে দেওয়ার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে। পাগলা হাওয়া বারেবারে তার বুকের বসন উড়িয়ে দিয়ে বেচারিকে আরো অসম্বৃত, আরো বিব্রত করে তুলছে।

অনেকক্ষণ ধরে সেও আমার পানে চেয়ে রইল, আমিও তার পানে চেয়ে রইলাম। আমার কণ্ঠ তখন কথা হারিয়ে ফেলেছে।

সে ক্রমেই অস্তপারের-পথে পিছু হেঁটে যেতে লাগল। তার চোখের চাওয়া ক্রমেই মলিন সজল হয়ে উঠতে লাগল। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলার দরুন তার বুকের কাঁচুলি বায়ুর মুখে কচিপাতার মতো থরথর করে কাঁপতে লাগল। যতই সে আকাশ-পথ বেয়ে অস্ত-পল্লির পথে চলতে লাগল, ততই তার মুখ-চোখ মূর্ছাতুরের মতন হলদে ফ্যাকাসে হয়ে যেতে লাগল। তারপর পথের শেষ-বাঁকে দাঁড়িয়ে সে তার শেষ অচপল অনিমেষ চাওয়া চেয়ে আমায় একটি ছোট্ট সেলাম করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হিয়ায় হিয়ায় আমার শুধু একটি কাতর মিনতি মূঢ়ের মতো না-কওয়া ভাষায় ধ্বনিত হচ্ছিল —'হায় সন্ধ্যা-লক্ষ্মী আমার, হায়!'

হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি কত বছর ধরে যে এই রকম করে, রোজ সন্ধ্যা-লক্ষ্মীর পানে চেয়ে চেয়ে আসছি তা কিছুতেই স্মরণ হয় না। শুধু এইটুকু মাত্র মনে পড়ে যে, সে-কোন যুগে যেন আমি আজিকার মতনই এমনি করে প্রভাতের শুকতারাটির পানে শুধু উদয়-পথে তাকিয়ে থাকতাম। আমার সমস্ত সকাল যেন কোন প্রিয়তমার আসার আশায় নিবিড় সুখে ভরে উঠত। রোজ প্রভাতে উদয়-পথে মুঠি-মুঠি করে ফাগ-মাখা ধূলি-রেণু ছড়াতে ছড়াতে সে আসত, তারপর আমার পানে চেয়েই সলজ্জ তৃপ্তির হাসি হেসে যেন বারেবারে আড়-নয়নের বাঁকা চাউনি হেনে বলত, 'ওগো

পথ-চাওয়া বন্ধু আমার, আমি এসেছি।' আমি তার চোখের ভাষা বুঝতে পারতাম, তার চাওয়ার কওয়া শুনতে পেতাম। ... তারপর অরুণদেব তাঁর রক্তচক্ষু দিয়ে আমাদের পানে চাইলেই সে ভীতা বালিকার মতো ছুটে আকাশ-আঙিনা বেয়ে ঊর্ধ্বে—ঊর্ধ্বে—আরো ঊর্ধ্বে উধাও হয়ে যেত। ছুটতে ছুটতেও কত হাসি তার! সারাদিন আমি শুনতে পেতাম তার ঐ পালিয়ে যাওয়া পথের বুকে তার কটি-কিঙ্কিণীর রিনিরিনি, হাতের পান্নার চুড়ির রিনিঝিনি আর পায়ের গুজরি পাঁইজোরের রুমুঝুমু। ... এমন করে দিন যায়। ... একদিন আমি বললাম, 'তুমি কি আমার পথে নেমে আসবে না প্রিয়?' সে আমার পানে একটু তাকিয়েই সিঁদুরে আমের মতো রেঙে উঠে আধ-ফোটা কথায় কেঁপে কেঁপে বললে, 'না প্রিয়, আমায় পেতে হলে তোমাকে এই তারারই একটি হতে হবে। আমি নেমে যেতে পারি নে, তোমাকে আমার পথেই উঠে আসতে হবে।' বলবার সময় অনামিকা অঙ্গুলি দিয়ে তার বেনারসি চেলির আঁচলপ্রান্ত যেমন সে আনমনে জড়িয়ে যাচ্ছিল, তার চোখের চাওয়া মুখের কথা সেদিন যেন তেমনি করেই অসহ্য ব্যথা-পুলকে জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল। বুঝলাম, সে বিশ্বের চিরন্তন ধারাটি বজায় রেখেই আমার সঙ্গে মিলতে চায়। আমার সৃষ্টিছাড়া-পথে বেরিয়ে পড়তে তার কোমল বুকে সাহস পাচ্ছে না। যতই ভালোবাসুক না, আমার পথ-হারা পথে চলতে—আমার বিপুল ভার বয়ে সেই অজানা ভয়ের পথে চলতে—সে যেন কিছুতেই পারবে না।

কিন্তু তাই কি?

হয়তো তা ভুল। কেননা একদিন যেন সে বলেছিল, 'প্রিয়তম, এ যে তোমার ভুলের পথ, এ পথ তো মঙ্গলের নয়। আঘাত দিয়ে তোমায় এ পথ হতে ফিরাতেই হবে। তোমায় কল্যাণের পথে না আনতে পারলে তো আমি তোমার লক্ষ্মী হতে পারিনে!' সেকথা যেন আজকের নয়, কোন অজানা নিশীথে আমি ঘুমের কানে শুনেছিলাম। তখন তা কিন্তু বুঝতে পারিনি।

আমি যেমন কিছুতেই তার চিরন্তন ধারাটির একগুঁয়েমি সইতে পারলাম না, সেও তেমনি নিচে নেমে আমার পথে এল না।

বিদায় নেবার দিনও সে তেমনি করে হেসে গেছে। তেমনি করেই তার দুষ্টু চটুল চাউনি দিয়ে সে আমায় বারেবারে মিষ্টি বিদ্রূপ করেছে। শুধু একটি নতুন কথা শুনিয়ে গেছ্‌ল, 'আর এপথে আমাদের দেখা হবে না প্রিয়, এবার নতুন করে নতুন পথে নতুন পরিচয় নিয়ে আমরা আমাদের পূর্ণ করে চিনব।'

তার বিদায়-বেলার যে দীঘল শ্বাসটি শুনিনি, আজ আমি সারা বাতাসে যেন সেই ব্যথিত কাঁপুনিটুকু অনুভব করছি। এখন সে বাতাস নিতেও কষ্ট হয়। ... কবে আমার এ নিশ্বাস-প্রশ্বাসে-টেনে-নেওয়া বায়ুর আয়ু চিরদিনের মতো ফুরিয়ে যাবে প্রিয়? ... তার বিদায় চাওয়ার যে ভেজা দৃষ্টিটুকু আমি দেখেও দেখিনি, আজ সারা আকাশের কোটি কোটি তারার চোখের পাতায় সেই অশ্রুকণাই দেখতে পাচ্ছি। এখন তারা হাসলেও মনে হয়, ও শুধু কান্না আর কান্না।

তারপর রোজ আসি রোজ যাই, কিন্তু উদয়-পথে আর তার রাঙা চরণের আলতার আলপনা ফুটল না! এখন অরুণ রবি আসে হাসতে হাসতে। তার সে হাসি আমার অসহ্য। পাখির কণ্ঠে বিভাস সুর আমার কানে যেন পূরবীর মতো করুণ হয়ে বাজে। ...

আমি বললাম, 'হায় প্রিয়তম, তোমায় আমি হারিয়েছি!' দেখলাম, আকাশ-বাতাস আমার সে কান্নায় যোগ দিয়ে বলছে, 'তোমায় হারিয়েছি!' তখন সন্ধ্যা—ঐ সিন্ধু-বেলায়।

হঠাৎ ও' কার চেনা-কণ্ঠ শুনি? ও' কার চেনা-চাওয়া দেখি? ও' কে রে, কে?

বললাম, 'আজ এ বধূর বেশে কোথায় তুমি প্রিয়?' সে বললে, 'অস্ত-পথে!'

সে আরো বলে গেছে যে, সে রোজই তার ম্লানমূর্তি নিয়ে এই অস্ত-গাঁয়ের আকাশ-আঙিনায় সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখাতে আসবে। আমি যেন আর তার দৃষ্টির সীমানায় না আসি।

বুঝলাম সে যতদিন অস্ত-পারের দেশে বধূ হয়ে থাকবে, ততদিন তার দিকে তাকাবারও আমার অধিকার নেই। আজো সে তার জগতের সেই চিরন্তন সহজ ধারাটুকুকে বজায় রেখে চলছে। সে তো বিদ্রোহী হতে পারে না। সে যে নারী—কল্যাণী। সে-ই না বিশ্বকে সহজ করে রেখেছে, তার অনন্ত ধারাটিকে অক্ষুণ্ন সামঞ্জস্য দিয়ে ঘিরে রেখেছে।

শুধোলাম, 'আবার কবে দেখা হবে তবে? আবার কখন পাবো তোমায়?' সে বললে, 'প্রভাতবেলায় ওই উদয়-পথেই।'

আজ সে বধূ, তাই তার সাঁঝের-পথে আর তাকাইনি।

জানিনে, কবে কোন উদয়-পথে কোন নিশিভোরে কেমন করে আমাদের আবার দেখা শোনা হবে। তবু আমার আজো আশা আছে, দেখা হবেই, তাকে পাবই।

* * *

সিন্ধু পেরিয়ে ঘরের আঙিনায় যখন একা এসে ক্লান্ত চরণে দাঁড়ালাম, তখন ভাবিজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাঁ ভাই, তুমি নাকি বে করেছ?' আমি মলিন হাসি হেসে বললাম 'হাঁ।' তিনি হেসে শুধোলেন, 'তা বেশ করেছ। বধূ কোথায়? নাম কি তার?'

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলাম। শ্রী-রাগের সুরে সুর-মূর্ছিতা মলিনা সন্ধ্যার ঘোমটার কালো আবছায়া যেন সিয়াহ্ কাফনের মতো পশ্চিম-মুখী ধরণীর মুখ ঢেকে ফেলতে লাগল। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

তারপর অতিকষ্টে ঐ পশ্চিম-পারের পানে আঙুল বাড়িয়ে বললাম, 'অস্তপারের সন্ধ্যালক্ষ্মী।'

ভাবিজানের ডাগর আঁখিপল্লব সিক্ত হয়ে উঠল; দৃষ্টিটুকু অব্যক্ত ব্যথায় নত হয়ে এল। কালো সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে নেমে এল!

রাক্ষুসী

(বীরভূমের বাগদীদের ভাষায়)

[ক]

আজ এই পুরো দুটো বছর ধরে ভাবছি, শুধু ভাবছি,—আর সবচেয়ে আশ্চয্যি হচ্ছি, লোকে আমাকে দেখলেই এমন করে ছুটে পালায় কেন। পুরুষেরা, যাঁরা সব পর্দার আড়ালে গিয়ে মেয়ে-মহলে খুব জাঁদরেলি রকমের শোরগোল আর হল্লা করেন, আর যাঁদের সেই বিদঘুটে চেঁচানির চোটে ছেলেমেয়েরা ভয়ে 'নফসি নফসি' করে, সেই মদ্দরাই আবার আমায় দেখলে হুঁকো হাতে দাওয়া হতে আস্তে আস্তে সরে পড়েন, তখন নাকি তাদের অন্দর-মহলে যাবার ভয়ানক 'হাজত' হয়। মেয়েরা আমাকে দেখলেই কাঁক হতে দুম করে কলসি ফেলে সে কি লম্বা ছুট দেয়! ছেলেমেয়েরা তো নাকমুখ সিঁটকে ভয়ে একেবারে আঁৎকে ওঠে! হাজার গজ দূর থেকে বলে, 'ওরে বাপরে, ঐ এল পাগলি রাক্ষুসী মাগি, পালা—পালা! খেলে, খেলে!'—কেনে। আমি কোন উনোনমুখো সুঁটকোর পাকা ধানে মই দিয়েছি? কোন খালভরা ড্যাকরার মুখে আগুন দিয়েছি? কোন চোখখাগি আবাগির বেটির বুকে বসে তপ্ত খোলা ভেঙেছি? কার গতর আমকাঠ না কুল-কাঠের আখায় চড়িয়েছি? কোন ছেলেমেয়ের কাঁচা মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছি? বল তো বুন, তাদের কি 'সরোকার' আছে আমায় যা তা বলবার? কে তারা আমার?—মেরেছি?—বেশ করেছি, নিজের 'সোয়ামিকে' মেরেছি! ... শুধু মেরেছি? দা দিয়ে কেটেছি। তাতে ওদের এত বুক চড় চড় করবে কেনে? ওদের কারুর বুক থেকে তো সোয়ামিকে কেড়ে লি নাই, আর হত্যেও করি নাই, তাতে ওদের কথা বলবার আর সাওখুড়ি করবার কি আছে? ওরা কি আমার সাতপুরুষে কুটুম না গিয়াস্ত? যদি এই রকমই করতে থাকে, তবে আমি সত্যিকারের রাক্ষুসীই হয়ে দাঁড়াব বলে রাখছি। তখন এক এক দায়ের কোপে ওদের সোয়ামির মাথাগুলো ধড় থেকে আলাদা করে দিব, মেয়েগুলোর বুক ফেঁড়ে কলজেগুলো ধরে পিষে পিষে দিব, তবে না সে আমার নাম সত্যিসত্যিই রাক্ষুসী হয়ে দাঁড়াবে!

আমায় পাগল করলে কে? এই মানুষগুলোই তো—আমি তো ফের তেমনি করেই যেন কিছু হয় নাই—ঘর পেতেছিলুম। রাত্তির দিন আমার কানের গোড়ায় আনাচে-কানাচে, পথে-ঘাটে, কাজেকর্মে, মজলিসে-জৌলুসে আমার নামে রাক্ষুসী রাক্ষুসী বলে

কুৎসা, ঘেন্না, মুখ ব্যাঁকানি, চোখ রাঙানি,—এইসব মিলেই তো আমার মাথার মগজ বিগড়ে দিল? যে ব্যথাটাকে আমি আমার মনের মাঝেই চেপে রেখেছিলুম, সেটাকে আবার জাগিয়ে তুলে চোখের সামনে সোজা করে ধরলে তো এরাই! আচ্ছা তুই বল তো বুন, এ পাগল হওয়ার দোষটা কার? একটা ভালো মানুষকে খোঁচা মেরে মেরে ক্ষেপিয়ে তুললে সে দোষটা কি সেই ভালো মানুষের, না যে ভালো মানুষেরা তাকে ক্ষেপিয়ে তোলে, তাদের?—

'আমার সোয়ামি ছিল সাদাসিধে মানুষ, সে তো সোজা ছাড়া বাঁকা কিছু জানত না। সে চাষ করত, কিরষাণি করত, আমি সারাটি দিন মাছ ধরে চাল কেঁড়ে, ধান ভেনে' আনতুম। তা না হলে চলবে কি করে দিদি? তখন আমাদের তিনটি পুষ্যি,—বড় ছেলে সোমত্থ হয়ে উঠেছে, বেথা না দিলে 'উপর-নজর' হবে, মেয়েটাও ঢ্যাং-ঢেঙিয়ে বেড়ে উঠেছিল আর আমার 'কোলপুঁছা' ছোট মেয়েটিরও তখন হাঁক্কো হাঁক্কো করে দু-একটি কথা ফুটছিল। ছা-পোষা মানুষ হলেও দিদি আমাদের সংসারে তো অভাব ছিল না কোনো কিছুর, তোমাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে। এই বিন্দিই তখন নাই নাই করে দিনের শেষে তিনটি সের চাল তরকারির জন্যে মাছ রে, শামুক রে, গুগলি রে পিথিমির জিনিস জোগাড় করে আনত। তাছাড়া বড় ছেলেটাও তোমাদের শীচরণের আশীর্বাদে করে-কর্মে দুপয়সা ঘরে আনছিল। মেয়েটাও পাড়ার বৌ-ঝিদের সঙ্গে যা দু-চারটে শাগ-মাছ আনত, তাতেও নেহাৎ কম পয়সা হত না। লুন-তেলের খরচটা ওর দিয়েই বেশ দিব্যি চলে যেত। এসবের উপর সোয়ামি বছরের শেষে চাষবাস আর কিরষাণি করে যা ধান-চাল আনত, তাতে সারা বছর খুব 'সচল বচল' করে খেয়েও ফুরাত না। সংসারের তখন কি ছিরিই ছিল। লক্ষ্মী যেন মুখ তুলে চেয়েছিলেন। এত সব কার জন্যে—ঐ ছেলে-মেয়েগুলির জন্যেই তো? সারাদিন রেতে একটি সেরের বেশি চাল রাঁধতুম না। বলি আহা, শেষে আমার ছেলেরা কষ্ট পাবে! সোয়ামি আর ছেলেগুলোকে দিতুম ভাত, আর নিজে খেতুম মাড়-শুদ্ধু ভাতের ফেন! মেয়েমানষের আবার সুখ কি, ছেলেমেয়ে যদি ঠাণ্ডা রইল তাতেই আমাদের জান-ঠাণ্ডা! নাইবা হলুম জমিদার। আমরা তো কারুর কাছে ভিক্ষে করতুম না, চুরি-দারিও করতুম না। নিজের মেহনতের পয়সা নেড়ে-চেড়ে খেতুম। নিজে খেতুম, আর পালে রে পার্বণে রে যেমন অবস্থা দু-দশটা অতিথ-ফকিরকেও খাওয়াতুম। আহা, ওতেই তো আমার বুক ভরে ছিল দিদি! লোকে বলত আমি নাকি বড্ডো 'কিরপিন'; কারণ আমি একটি পয়সা বাজে খরচ করতুম না। তা বললে আর কি করব, তাতে আমার বয়ে যেত না। তারা তো জানত না, আমার মাথায় কি বোঝা চাপানো রয়েছে। দু'দুটো মেয়ে আর একটি ছেলের বিয়ে দিতে হবে, বাড়িতে বউ আসবে, জামাই আসবে, আমার এই মাটির ঘরই আনন্দে ইন্দিরপুরী হয়ে উঠবে, দুটো সাদ-আরমান আছে—তাতে কত খরচ বল দিকিনি বুন? দায়ে ঠেকলে কেউ একটা পয়সা কর্জ দিয়ে চালাবে? বাপরে বাপ এই বিন্দির অজানা নেই গো, গলায় সাপ বেঁধে পড়লেও কোনো বেটি একটি খুদকণা দিয়ে শুধোয় না। তার আবার গুমোর!

আমার কাছে ও-সব শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজে না বাপু! তরে বুঝতুম, অনেক কড়ুই রাঁড়ির বুক চচ্চড় করত হিংসেয়, আমাদের এই এতটুকু সুখ দেখে।

এমনি করেই খুব সুখে দিন যাচ্ছিল আমাদের। আমি মনে করতুম, আর যটা দিন বাঁচি এমনি করে সোয়ামির সেবা করে, ছেলে-মেয়ে চরিয়ে, নাতিপুতি দেখে আমার হাতের নোওয়া অক্ষয় রেখে মরি; কিন্তু তা আমার পোড়া বিধাতার সইল না। আমার সাধের ঘরকন্না শ্মশানপুরী হয়ে গেল! আমার এত আশা-ভরসা সব-তাতে চুলোর ছাই-পাঁশ পড়ল! শুনে যা দিদি, শুনে যা সব, আর যদি দোষ দেখিস তো তোর ঐ মুড়ো খ্যাংরা দিয়ে আমার বিষ ঝেড়ে দিয়ে যাস, সাত উনুনের বাসি ছাই আমার পোড়া মুখে দিয়ে দিস! হায় বুন, আমার 'দুখখুর' কথা শুনলে পাথর গলে মোম হয়ে যায়, কিন্তু গাঁয়ের এই বেদিল মানুষগুলো আমায় এতটুকু পেরবোধ তো দেয়ই না, তার উপর রাত্তির-দিন নানান কথা বলে জানটাকে খেপিয়ে তুলেছে। মনে করি আমার সব পেটের কথা কারুর কাছে তন্নতন্ন করে বলি আর খুব একচোট কেঁদে নিয়ে মনটাকে হালকা করি। তা যারই কাছ ঘেঁষতে চাই, সেই মনে করে এই আমায় খেলেরে! আমি যেন ডাইনি কুহুকিরও অধম! এই 'হেনস্থা' আর ভয় করার দরুনে আমার সমস্ত মগজটা চমচম করে ধরে যায়। কাজেই আমার পাগলামি তখন আরো বেড়ে যায়। সাধে কি আমার মুখ দিয়ে এত গালিগালাজ শাপমন্যি বেরোয়, বুন! তুই সব কথা শুন আর নাথি মেরে আমার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়ে যা!

[খ]

তু তো বরাবরই জানতিস দিদি, আমাদের পাঁচুর বাপ ছিল বরাবরকার সিদেসাধা মানুষ, সে হের-ফের বা কথার প্যাঁচ বুঝত না। নাকটা সোজাসুজি না দেখিয়ে হাতটা পিঠের দিক দিয়ে বাঁকিয়ে এনে দেখানোটা তার মগজে আদৌ ঢুকত না। কত আঁটকুঁড়ো নদী-ভরাই যে ওকে দিয়ে বিনি পয়সায় বেগার খাটিয়ে নেত, হাত হতে পয়সা ভুলিয়ে নেত, তার আর সংখ্যা নাই। ঐ নিয়ে বেচারাকে আমি কতদিন গালমন্দ দিয়েছি, কত বুদ্ধি দিতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। কথায় বলে, 'স্বভাব যায় না মলে'—ওর আর একটা বদ-অভ্যেস ছিল, ও বড্ড মদ খেত। কতদিন বলেছি, 'তুমি মদ খাও ক্ষতি নাই, দেখো তোমায় মদে যেন না খায়!' কিন্তু সে তা শুনত না; একটু ফাঁক পেলেই যা রোজগার করত তা সব শুঁড়ির পায়ে ঢেলে আসত। যাক, ওরকম দুচারটে বদ-অভ্যাস পুরুষমানুষের থাকেই থাকে—ওতে তেমন আসত যেত না, কিন্তু অমন শিবের মতো সোয়ামি আমার শেষে এমন কাজ করে ফেললে, যা বুন তুই কেন—আমারও এখন বিশ্বাস হচ্ছে না। তার মত অমন সোজা লোক পেয়ে কে কি খাইয়ে দিয়ে তাকে যে অমন করে দিয়েছিল, তা আমি নিজেই বুঝতে পারি নাই।

জানিস ওপাড়ার রথো বাগদির দু-তিনটে 'স্যাঙ্গা-করা' 'কড়ুই রাঁড়ি' মেয়েটা কি-রকম পাড়া মাথায় করে তুলেছিল। ছুঁড়ি কখনো সোয়ামির ঘর তো করেই নাই, মাঝ থেকে পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের কাঁচা বুকে ঘুণ ধরিয়ে দিচ্ছিল। আর তার বাপ-মাকেই বা কি বলব,—ছি, আমারই মনে হতো যে, বিষ খেয়ে মরি ! মাগো মা, বাগদী জাতটার ওপর ঘেন্না ধরিয়ে দিলে !—

তু তো জানিস মাখন-দি, ঝুটমুট আমাদের গাঁয়ের লোকের আর আমাদের বাগদিগুলোর বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের হাতে অনেক টাকা আছে। আবার সে কত পুত্‌খাগির বেটিরা লোকের ঘরে ঘরে রটিয়ে এসেছিল, আমরা নাকি যক্ষির টাকা পেয়েছি। বল তো বুন, এতে হাসি পায় না?

'হেঁ,—আমাদের ঐ টাকার লোভেই ঐ 'রাঁড় হয়ে ষাঁড় হওয়া' ছুড়িটা ঐ শিবের মতন সোজা ভোলানাথ সোয়ামিকে আমার পেয়ে বসল। আর সত্যি বলতে কি, মিনসের চেহারাও তো আর নেহাৎ মন্দ ছিল না ! ধুতি-চাদর পরিয়ে দিলে মনে হতো একটি খাসা 'ভদ্দরনুক'।

ওরে যেদিন আমি পেত্থম এই কথাটি শুনলুম, তখন আমার মনটা যে কেমন হয়ে গেল, তা বুন তোকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। মাথায় বাজ পড়লেও বোধ হয় লোকে অত বেথা পায় না। আমি সেদিন তাকে রাতে খুব ঝাঁটাপেটা করলুম। অ বুন !—যে অমন মাটির মানুষ, সাত চড়ে যার রা বেরোত না, সেও কিনা সেদিন আমার এই ঝুঁটি ধরে একটা চেলাকাঠে করে উঃ সে কি মার মারলে ! কাঠটার চেয়েও বেশি ফেটে ফেটে আমার পিঠ দিয়ে রক্ত পড়তে নাগল। কিন্তু সত্যি বলতে কি, তখনকার এত যে বাইরের বেথা, তাতো আমি বুঝতে পারছিলুম না, কেননা আমার বুকটা তখন আরো বেশি ফেটে গিয়েছিল। আমি যে সেদিন স্পষ্ট বুঝলুম, আমার নিজের সোয়ামি আজ পর হলো। আমি দেখতে পেলুম, আমার কপাল পুড়েছে। তখন ঠিক যেন কেউ তপ্ত লোহা দিয়ে আমার বুকের ভিতরটায় ছ্যাঁকা দিচ্ছিল—আমি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলুম !

সেই সঙ্গে আমার যত রাগ হলো, সেই হারামজাদি বেটির উপর। মনে হতে লাগল, এখন যদি তাকে পাই, তো নখে করে ছিঁড়ে ফেলি। কিন্তু কোনোদিনই তার নাগাল পাই নাই। সে আমাকে দেখলেই সরে পড়ত।

[গ]

ক্রমেই আমার সোয়ামি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করলে। সে আর প্রায়ই ঘরে আসত না ! মুনিব-ঘরে খাটত, খেত, আর ওদের ঘরটাতেই গিয়ে শুয়ে থাকত ! আমি, আমার ছেলে, পাড়ার সব ভালো লোক মিলে কত বুঝালুম তাকে। কিন্তু হায়, তাকে আর ফিরাতে পারলুম না, ছুঁড়ি যে ওকে জাদু করেছিল ! একেবারে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছিল !

তখন বুঝলুম এতদিনে মিনসের ভীমরতি ধরেছে ; ওকে 'ঊনপঞ্চাশে' পেয়েছে ; তা নইলে কি এমন চোখের মাথা খেয়ে বসে লোকে ! একদিন পায়ে ধরে জানালুম, সে কত বড় ভুল করতে যাচ্ছে। সে আমার মুখে লাথি মেরে চলে গেল। আমার সারা দেহ দিয়ে আগুনের মতো গরম কি একটা ঠিকরে বেরুতে লাগলো। বুঝলুম সে এত বেশি এগিয়ে গিয়েছে নরকের দিকে যে, তাকে ফেরানো যায় না।

তার উপর রাস্তায়-ঘাটে ঐ বিশ্রী কথাটা নিয়ে আমায় গঞ্জনা—খোঁচা। আমি খেপার মতো হয়ে পেতিজ্ঞা করলুম, শোধ নেব, শোধ নেব। তবে আমার নাম বিন্দি !

আর একদিন মাঠ হতে এসে শুনলুম মিনসে নাকি আমার বাকস ভেঙে জোর করে যা দু-চার পয়সা জমিয়েছিলুম সব ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, একটা কানাকড়িও থুয়ে যায় নাই। আরো শুনলুম, তার দু-দিন পরেই নাকি ঐ ছুঁড়ির সঙ্গে তার 'স্যাঙ্গা' হবে। সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে। সে নাকি ঐ সমস্ত নগদ টাকা নিয়ে গিয়ে তার হবু-শ্বশুরের 'শীপাদপদ্মে' ঢেলেছে।—হায়রে আমার রক্তের চেয়েও পিয়ারা টাকা ! তার এই দশা হলু শেষে ? মানুষ এত নিচু দিকে যেতে পারে ? তখন ভাববার ফুরসৎ ছিল না ; ঐ দু-দিনের মধ্যেই যা করবার একটা করে নিতে হবে, তারপর আর সময় পাওয়া যাবে না। ভাবতে লাগলুম, কি করা যায় ? একটা দেবতার মতো লোক সিধা নরকে নেমে যাচ্ছে এক-এক পা করে, আর বেশি দূর নাই, অথচ ফিরাবার কোনো উপায় নাই। তখন তাকে হত্যা করলে কি পাপ হয় ? তাছাড়া আমি তার 'ইস্ত্রি', আমারও তো একটা কর্তব্য আছে, আমার সোয়ামি যদি বেপথে যায়, তো আমি না ফিরালে অন্য কে এসে ফিরাবে ? আর সে এই রকম বেপথে গেলে ভগবানের কাছে ধর্মত আমিই তো দায়ী। ধর আমি যদি তাকে এই সময়ে একেবারে শেষ করে ফেলি তাহলে তার তো আর কোনো পাপ থাকবে না। যত পাপ হবে আমার। তা হোক, সোয়ামির পাপ তার 'ইস্ত্রি' নেবে না তো কি নেবে এসে শেওড়াগাছের ভূত ?

আমি মনকে শক্ত করে ফেললুম ! হাঁ, হত্যেই করব যা থাকে কপালে !—ভগবান, তুমি সাক্ষী রইলে, আমি আমার দেবতাকে নরকে যাবার আগে তাঁর জানটা তোমার পায়ে জবা ফুলের মতো 'উচ্ছুগু' করব, তুমি তাঁর সব পাপ খণ্ডণ করে আমাকে শুধু 'দুখখু' আর কষ্ট দাও। আমার তাই আনন্দ।

'সেদিন সাঁঝে একটু ঝিমঝিম বিষ্টির পর মেঘটা বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে ! এমন সময় দেখতে পেলুম, আমার সোয়ামি একা ঐ আবাগিদের বাড়ির পেছনের তেঁতুল গাছটার তলায় বসে খুব মন দিয়ে একটা খাটের খুরোয় র‍্যাঁদা বুলোচ্ছে !—কি করতে হবে ঝাঁ করে ভেবে নিলুম ! চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম কেউ কোথাও নাই। আমি পাগলির মতো ছুটে এসে দাটা বের করে নিলুম, সাঁঝের সূর্যটার লাল আলো দাটার উপর পড়ে চকমক করে উঠল ! ঐ ঝাপসা রোদেই আবার বিষ্টি নেমে এল—ঝিম্ ঝিম্ ঝিম ! বাড়ির পাশে তখন একপাল ন্যাংটা ছেলে জলে ভিজতে ভিজতে গাইছিল—

'রোদে রোদে বিষ্টি হয়,
খ্যাঁকশিয়ালের বিয়ে হয়।'

আমি আঁচলে দাটা লুকিয়ে দৌড়ে বাঘিনীর মতো গিয়ে, ওঃ সেকি জোরে তার বুকে চেপে বসলুম। সে হাজার জোর করেও আমায় উলটিয়ে ফেলতে পারলে না। তার ঘাড়ে মস্ত একটা কোপ বসিয়ে দিতেই আমার হাতটা অবশ হয়ে এল। তখন সে দৌড়ে পাশের পাটখেতটায় গিয়ে চিৎকার করে পড়ল! আমি তখন রক্তমুখো হয়ে উঠেছি। আমি আবার গিয়ে দুটো কোপ বসাতেই তার ঘাড় হতেই মাথাটা আলাদা হয়ে গেল। তারপর খালি লাল আর লাল! আমার চারিদিকে শুধু রক্ত নেচে বেড়াতে লাগল। তারপর কি হয়েছিল আমার আর মনে নেই।

'যেদিন আমার বেশ জ্ঞান হলো সেদিন দেখলুম আমি একটা নতুন জায়গায় রয়েছি, আর তার চারিদিকে সে কতই রং-বেরং-এর লোক। আর সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছিলুম এই দেখে যে, আমিও তাদের মাঝে খুব জোরে জাঁতা পিষছি! এতদিনের পর সূর্যের আলো—ওঃ সে কত সুন্দর সাদা হয়ে দেখাল! এর আগে চোখের পাতায় শুধু একটা লাল রঙ ধু ধু করত। জিজ্ঞাসা করে জানলুম, ওটা শিউড়ির জেলখানা। আমার সাত বছরের জেল হয়েছে! এই-মাত্তর তিনমাস গিয়েছে। আমি নাকি মাজিস্টার সাহেবের কাছে সব কথা নিজ মুখে স্বীকার করেছিলুম। তবে আমার শাস্তি অত হতো না—দারোগাবাবু গাঁয়ে গিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করায় আমি নাকি তাকে খ্যাংরোপেটা করে বলেছিলুম, সে যেন জোরজুলুম না করে গাঁয়ে, সে-ই নাকি সাহেবকে বলে এত শাস্তি দিইয়ে দিয়েছে।

'মাগো মা! সে কি খাটুনি জেলে! তবু দিদি, যতদিন মনে ছিল না কিছু, ততদিন যে বেশ ভালো ছিলুম। জ্ঞান হয়ে সে কি জ্বালা। তখন কাজের অকাজের মাঝে চোখের সামনে ভেসে উঠত সেই ফিং-দিয়ে-ওঠা হলকা হলকা রক্ত! ওঃ কত সে রক্তের তেজ! বাপরে বাপ! সে মনে পড়লেও আমি এখনো বেহুঁশ হয়ে পড়ি! মাথাটা যখন কাটা গেল, তখন ঐ আলাদা ধড়টা, কাৎলা মাছকে ডেঙায় তুললে যেমন করে, ঠিক তেমনি করে কাৎরে কাৎরে উঠছিল! এত রক্তও থাকে গো একটা এতটুকু মানুষের দেহে! আমি একটুকুও আঁধারে থাকতে পারতুম না ভয়ে! কেননা তখন স্পষ্ট এসে দেখা দিত সেই মাথাছাড়া দেহটা আর দেহছাড়া মাথাটা! —ওঃ—

তারপর দিদি, কোন জজ নাকি -সাত-সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এসে দিল্লির বাদশাহি তকতে বসলেন, আর সব কয়েদিরা খালাস পেলে। আমিও তাদের সাথে ছাড়া পেলুম।

'দেখলি দিদি, ভগবান আছেন! তিনি তো জানেন, আমি ন্যায় ছাড়া অন্যায় কিছু করি নাই। নিজের সোয়ামি-দেবতাকে নরকে যাবার আগেই ও-পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছি। পুরুষেরা ওতে যাই বলুক, আমি আর আমার ভগবান এই দুই জনাতেই জানতুম, এ একটা মস্ত সোজাসুজি সত্যিকার বিচার! আর পুরুষেরা ও-রকম চেঁচাবেই,—কারণ তারা দেখে আসছে যে, সেই মান্ধাতার আমল থেকে শুধু মেয়েরাই কাটা পড়েছে তাদের দোষের জন্যে। মেয়েরা পেথম পেথম এই পুরুষদের মতোই

চেঁচিয়ে উঠেছিল কি না এই অবিচারে, তা আমি জানি না। তবে ক্রমে তাদের ধাতে যে এ খুবই সয়ে গিয়েছে এ নিশ্চয়। আমি যদি ঐরকম একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসতুম আর যদি আমার সোয়ামি ঐ জন্যে আমাকে কেটে ফেলত, তাহলে পুরুষেরা একটি কথাও বলত না। তাদের সঙ্গে মেয়েরাও বলত, 'হাঁ, ওরকম খারাপ মেয়েমানুষের ঐ রকমেই মরা উচিত।' কারণ তারাও বরাবর দেখে আসছে, পুরুষদের সাত খুন মাফ!

'তাছাড়া, আমি মানুষের দেওয়ার চেয়ে অনেক বড় শাস্তি পেয়েছিলুম নিজের মনের মাঝে। আমার জ্বালাটা যে সদা-সর্বদা কিরকম মোচড়ে মোচড়ে উঠত, তা কে বুঝত বল দেখি, বুন? নিজের হাতে কাটলেও সে তো ছিল আমার নিজেরই সোয়ামি! কোন জজ নাকি তার নিজের ছেলের ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন, তাহলেও—অত শক্ত হলেও—তাঁর বুকে কি একটুকুও লাগে নাই ঐ হুকুমটা দিবার সময়?—আহা, যখন তার বুকে বসে একটা পেরকাণ্ড রাক্ষুসীর মতোই তার গলায় দাটা চেপে ধরলুম, তখন আঃ, কি মিনতি-ভরা গোঙানিই তার গলা থেকে বেরোচ্ছিল! চোখে কি সে একটা ভীত চাউনি আমার ক্ষমা চাইছিল।—আঃ! আঃ!

'জেলে রাত্তিরদিন কাজের মধ্যে ব্যস্ত থেকে কোনো কিছু ভাববার সময় পেতুম না। মনটাকে ভাববারই সময় দিতুম না। কাজের উপর কাজ চাপিয়ে তাকে এত বেশি জড়িয়ে রাখতুম যে, শেষে যে ঘুম এসে আমাকে অবশ করে দিয়ে যেত, তা বুঝতেই পারতুম না। এখন, যেদিন ছাড়া পেলুম, সেদিন আমার সমস্ত বুকটা কিসের কান্নায় হা হা করে চেঁচিয়ে উঠল। এতদিন যে বেশ ছিলুম এই জেলের মাঝে! এতদিন আমার মনটা যে খুব শান্ত ছিল! এখন এই ছাড়া পেয়ে আমি যাই কোথা? ওঃ ছাড়া পাওয়ার সে কি বিষের মতন জ্বালা!

'ঘরেই এলুম!—দেখলুম আমার ছেলে বে করেছে। বেশ টুকটুকে মেনিপরা বৌটি। আমি ফিরে এসেছি শুনে গাঁয়ের লোকে 'হাঁ হাঁ' করে ছুটে এল; বললে 'গাঁয়ে এবার মড়কচণ্ডি হবে। বাপরে, সাক্ষাৎ তাড়কা রাক্ষসী এবার গাঁয়ে ফিরে এসেছে, এবার আর রক্ষা নাই—নিঘ্‌ঘাত যমালয়!—' পেথম পেথম আমি তাদের কথায় কান দিতুম না। মনে করলুম, 'কান করেছি ঢোল, কত বলবি বল।' শেষে কিন্তু আর কান না দিয়েও যে পারলুম না। তাদের বলার মাঝে যে একটুও থামা ছিল না। যেন কিছুই হয় নাই এই ভেবে আমি আমার বৌ-বেটা নিয়ে ঘর-সংসার নতুন করে পাতলুম, লোকে তা লণ্ডভণ্ড করে দিলে। মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলুম, কেউ বিয়ে করলে না, বললে, 'রাক্ষুসীর মেয়ে রাক্ষুসী হবে, এ ডাহা সত্যি কথা!' এতদিন যে বেথাটা আমি দুহাত দিয়ে চাপা দিতে চাইছিলুম, সেইটাই দেশের লোক উসকে উসকে বের করে চোখের সামনে ধরতে লাগল! সোনার চাঁদ ছেলে আমার একটি কথাও শুনলে না—আমার যে কেমন করে কি হলো তা ভুলেও কোনো কথার মাঝে জিজ্ঞেস করলে না, খুশি হয়েই আমাকে সংসারের সব ভার ছেড়ে দিলে; কেননা সে বুঝেছিল, যা গিয়েছে তার খেসারতের জন্যে আর একজনকে হারাব কেনে! আর এই কড়ুইরাড়ি আঁটকুড়িরা যারা আমার সাত পুরুষের গিয়াত্‌কুটুম

নয়, তারা কিনা রাত্তিরদিন খেয়ে না খেয়ে লেগে গেল আমার পেছনে ! দেবতাদের শাপের মতো এসে আমাদের সব সুখশান্তি নষ্ট করে দিলে !—আমার ছেলেকে তারা একঘরে পতিত করলে, তাতেও সাধ মিটল না। নানান পেকারে—নানান ছুতোয় এই দুটো বছর ধরে কিনা কষ্টই দিয়েছে এই গাঁয়ের লোকে ! দিদি, পথের কুকুরকেও এত ঘেন্না হেনস্থা করে না ! এতে যে ভালো মানুষেরই মাথা বিগড়ে যায়, আমার মতো শতেকখুয়ারি ডাইনি রাক্ষুসীর তো কথাই নাই ! তাও দিদি খুবই সয়ে থাকি, নিতান্ত বিরক্ত না করে তুললে ওদের গালমন্দ দিই না। বত্রিশ নাড়ি পাক দিলে তবে কখনো লোকের মুখ দিয়ে 'শাপমন্যি' বেরোয় !

'এখন তো তুই সব শুনলি দিদি, এখন বল, দোষ কার? আর তুই ঐ হাতের মালসাটা আমার মাথায় ভেঙে আমার মাথাটা চৌচির করে দে—সব পাপের শাস্তি হোক !—ওঃ ভগবান ! !'

সালেক

[ক]

আজকার প্রভাতের সঙ্গে শহরে আবির্ভূত হয়েছেন এক অচেনা দরবেশ। সাগরমন্থনের মতো হুজুগে লোকের কোলাহল উঠেছে পথে, ঘাটে, মাঠে,—বাইরের সব জায়গায়। অন্তঃপুরচারিণী অসূর্যম্পশ্যা জেনানাদের হেরেম তেমনি নিস্তব্ধ নীরব,—যেমন রোজই থাকে দুনিয়ার সব কলরব 'হ-য-ব-র-ল'র একটেরে! বাইরে উঠছে কোলাহল,—ভিতরে ছুটছে স্পন্দন!

সবারই মুখে এক কথা 'ইনি কে? যাঁর এই আচমকা আগমনে নূতন করে আজ নিশিভোরে ঊষার পাখির বৈতালিক গানে মোচড় খেয়ে খেয়ে কেঁপে উঠল আগমনীর আনন্দ ভৈরবী আর বিভাস?'

ছুটেছে ছেলে মেয়ে বুড়ো সব একই পথে ঘেঁষাঘেঁষি করে দরবেশকে দেখতে। তবুও দেখার বিরাম নাই। দুঃশাসন টেনেই চলেছে কোন দ্রৌপদীর লজ্জাভরণ, এক মূক বিস্ময়-বিস্ফারিত-অক্ষি বিম্বের চোখের সুমুখে, আর তা বেড়েই চলেছে! তার আদিও নেই, অন্তও নেই। ওগো, অলক্ষ্যে যে এমন একটি দেবতা রয়েছেন, যিনি গোপনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেন না!

দরবেশ কথাই কয় না,—একবারে চুপ!

অনেকে বায়না ধরলে, দীক্ষা নেবে; দরবেশ ধরা-ছোঁয়াই দেয় না। যে নিতান্তই ছাড়ে না, তাকে বলে, 'কাপড় ছেড়ে আয়!' সে ময়লা কাপড় ছেড়ে খুব 'আমিরানাশানের' জামা জোড়া পরে আসে। দরবেশ শুধু হাসে আর হাসে, কিছুই বলে না।

শহরের কাজি শুনলেন সব কথা। তিনিও ধন্না দিতে শুরু করলেন দরবেশের কাছে। দরবেশ যতই আমল দিতে চায় না, কাজি সাহেব ততই নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থাকেন। দরবেশ বুঝলেন, এ ক্রমে 'কমলিই ছোড় তা নেই' গোছের হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাঁর মুখে ফুটে উঠল ক্লান্ত সদয় হাসির ঈষৎ রেখা।

[খ]

দরবেশ বললেন, 'শোনো কাজি সাহেব, আমি যা বলব তাই করতে পারবে?'

কাজি সাহেব আস্ফালন করে উঠলেন, 'হাঁ, হুজুর, বান্দা হাজির।'

দরবেশ হাসলে, তারপর বললে, 'দেখো, কাল জুম্মা। মুল্লুকের বাদশা আসছেন এখানে। নামাজ পড়বার সময় তোমায় 'ইমামতি' করতে বলবেন। তুমি সেই সময় একটা কাজ করতে পারবে?'

কাজি সাহেব বলে উঠলেন, 'আলবৎ হুজুর, আলবৎ! কি করতে হবে?'

দরবেশ বললে, 'তোমার দুবগলে দুটি মদের বোতল দাবিয়ে নিয়ে যেতে হবে; তারপর যেই নামাজে দাঁড়াবে, অম্নি মদের বোতল দুটি দিব্যি 'জায়নামাজের' উপর ভেঙে দেবে।'

কাজি সাহেবের মুখ হয়ে গেল নীল! কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'হুজুর, তাহলে আপনি আমা হতে মুক্তি পাবেন সত্যি, কেননা ওর পরেই আমার মাথা ধড় হতে আলাদা হয়ে যাবে, —কিন্তু আমার মুক্তি হবে কি?'

দরবেশ বললেন, 'অনেককেই ভব-যন্ত্রণা হতে মুক্তি দিয়েছ তুমি, একবার নিজের মুক্তিটাও তো দেখতে হবে!'

কাজি সাহেব চলে এলেন। ভাবলেন, 'যা থাকে অদৃষ্টে, কাল নিয়ে যাওয়া যাবে দুটো মদের বোতল মসজিদে। দরবেশ নিশ্চয়ই আমার চেয়ে বেশি জানেন।'

[গ]

বাদশা এসেছেন। সঙ্গে আছে সেনা-সামন্ত উজির-নাজির সব। জুম্মার নামাজ হচ্ছে! এমাম (আচার্য) হয়েছেন কাজি সাহেব। একটু পরই কাজি সাহেবের বগলতলা হতে খসে পড়ল দুটি ধেনো মদের বোতল! আর এটা বলাই বাহুল্য যে, সে বোতল সশব্দে বিদীর্ণ হয়ে যে বিশ্রী গন্ধে মসজিদ ভরিয়ে তুললে তাতে সকলেই একবাক্যে সমর্থন করলে যে, কাজি সাহেবের মতো মাতাল আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে হয়নি, হবেও না। যে মদ খায় তার ক্ষমা আছে, কিন্তু যাকে মদে খায় তার ক্ষমাও নেই, নিস্তারও নেই।

বৈঠক বসল, এ অসমসাহসিক মাতালের কি শাস্তি দেওয়া দরকার! উজির ছাড়া সভাস্থ সকলেই বললে, 'এর আবার বিচার কি জাঁহাপনা? শূলে চড়ানো হোক।' মন্ত্রী উঠে বললেন, 'এ বান্দার গোস্তাখি মাফ করতে আজ্ঞা হয় হুজুর! আমার বিবেচনায় এর মতো পাপিষ্ঠ লোকের মৃত্যুদণ্ড উপযুক্ত শাস্তি নয়। সবচেয়ে বেশি শাস্তি দেওয়া হবে যদি তার পদ আর পদবি কেড়ে নেন, আর যা কিছু সম্পত্তি তা বাজেয়াপ্ত করে নেন। মৃত্যুদণ্ড হলে তো সব ল্যাঠা চুকেই গেল। কিন্তু এই যে তার জীবনব্যাপী লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা, তা তাকে তিলে তিলে দগ্ধ করে মারবে।' বাদশা সমেত সভাস্থ সকলেই হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'তাই ভালো।'

পাশ দিয়ে উড়ো খইয়ের মতো একটা পাগলা যা তা বকে যাচ্ছিল, 'এইসব লাঞ্ছনা আর গঞ্জনাই তো চন্দন! আর ওতে কিছু দগ্ধ হয় না ভাই, স্নিগ্ধই হয়।'

[ঘ]

বাদশার দরবারে কাজি সাহেব যখন এই রকম লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে, সব হারিয়ে একটা অন্ধকার গলির বাঁকে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর দুর্দশা দেখে পথের কুকুরও কাঁদে! 'হাতি আড় হলে চামচিকেও লাথি মারে।' তিনি যখন শহরের কাজি ছিলেন, তখন হয়তো ন্যায়ের জন্যেও যাদিগে শাস্তি দিয়েছিলেন, তারাই সময় পেয়ে উত্তম-মধ্যম প্রহারের সঙ্গে জানিয়ে দিলে যে, চিরদিন কারুর সমান যায় না। আর যাদিগে অবিচার করে শাস্তি দিয়েছিলেন, তার প্রতিশোধ নিলে তারা যে রকম নিষ্ঠুরভাবে, তার চেয়ে শূলে চড়ে মৃত্যুও ছিল শ্রেয়।

এত লাঞ্ছনা আর গঞ্জনার মধ্যেও সে কার স্নিগ্ধ সান্ত্বনা ছুঁয়ে গেল আচমকা এসে, ঠিক যেন জ্বরের কপালে বাঞ্ছিতা প্রেয়সীর গাঢ় করুণ পরশের মতো। কাজি সাহেব বুকের শুকনো হাড়গুলোকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে উঠলেন, 'খোদা, এমনি করে আমার সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডুবিয়ে দিলে!'

'ওগো দরবেশ, কোথায় তুমি? কোন সুদূরের পারে?'

তারপর সেই সন্ধ্যায় সরীসৃপের মতো বুকের উপর ভর দিয়ে অতি কষ্টে কাজি সাহেব যখন তাঁর বাঞ্ছিত পথ বেয়ে দরবেশের আস্তানায় এসে পঁহুচলেন, তখন একটা শান্ত ঘুমের সোহাগ-ভরা ছোঁওয়ার আবেশে আঁখির পাতা জড়িয়ে আসছে! তবুও একবার প্রাণপণে আর্তনাদ করে উঠলেন, 'দরবেশ, দীক্ষিত করো!—আমি এসেছি, আর যে সময় নাই!'

পূরবীর মীড়ে, সন্ধ্যাগোধূলির সম্মিলনে যে একটা ব্যথার কাঁপুনি বয়ে গেল, তা কেউ লক্ষ্য করলে না!

কার শান্ত-শীতল ক্রোড় তাঁকে জানিয়ে দিলে, 'এই যে বাপ! এস! এখন তোমার মলিন বস্ত্র আর মলিন অহঙ্কার সব চোখের জলে ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে!'

দরবেশ সুরবাহারটায় ঝঙ্কার দিয়ে গেয়ে উঠলেন,

'বমে সাজ্জাদা রঙ্গিন কুন গরৎ পীরে মাগাঁ গোয়েদ!
কে সালেক বেখবর না বুদ জেরাহোরসমে মঞ্জেল হা!'

জায়নামাজে শারাব-রঙিন কর, মুর্শেদ বলেন যদি।
পথ দেখায় যে, জানে সে যে, পথের কোথায় অন্ত আদি।

সৎমা-তাড়ানো মাতৃহারা মেয়ের মতো অশ্রু আর অভিমান-আর্দ্র মুখে একটা ভারি কালো মেঘ সব ঝাপসা, ক্রমে অন্ধকার করে দিলে।

কাজি সাহেব প্রাণের বাকি সমস্ত শক্তিটুকু একত্র করে ভাঙা গলায় বললেন, 'কে? ওগো পথের সাথী! তুমি কে?'

অনেকক্ষণ কিছু শোনা গেল না! নদীর নিস্তব্ধ তীরে তীরে দুলে গেল আর্ত-গম্ভীর প্রতিধ্বনি, 'তু—মি—কে?'

খেয়া পার হতে খুব মৃদু একটা আওয়াজ কাঁপতে কাঁপতে কয়ে গেল, মাতাল হাফিজ!

স্বামীহারা

[ক]

ওঃ! কি বুক-ফাটা পিয়াস! সলিমা! একটু পানি খাওয়াতে পারিস বোন? আমার কেন এমন হলো, আর কি করেই এ কপাল পুড়ল, তাই জিজ্ঞেস করছিস—না? তা আমার সে 'দেরেগ'-মাথা 'রোনা' শুনে আর কি হবে বহিন। দোওয়া করি, তুই চির এয়োতি হ'! এসব পোড়াকপালির কথা শুনলেও যে তোদের অমঙ্গল হবে ভাই! খোদা যেন মেয়েদের বিধবা করবার আগে মরণ দেন, তা নইলে তাদের বে' হবার আগেই যেন তারা 'গোরে' যায়! তোর যদি মেয়ে হয় সলিমা, তালে তখনি আঁতুড় ঘরেই নুন খাইয়ে মেরে দিস, বুঝলি? নইলে চিরটা কাল আগুনের খাপরা বুকে নিয়ে কাল কাটাতে হবে।

তুই তো আজ দশ বছর এ গাঁ ছাড়া, তাই সব কথা জানিস না! সেই ছোট্টটি গিয়েছিলি, আজ একেবারে খোকা কোলে করে বাপের বাড়ি এসেছিস! ... আমি পাগল হয়ে গেছি ভেবে সবাই দূর হতে দেখেই পালায়। আচ্ছা তুইতো জানিস ভাই আমায়, আর এখনো তো দেখছিস সত্যি বলতো আমি কি পাগল হয়েছি? হাঁ ঠিক বলেছিস, আমি পাগল হইনি,—নয়?

সেবার—ঠিক মনে পড়ে না কতকাল আগে—বিধাতার অভিশাপ যেন কলেরা আর বসন্তের রূপ ধরে আমাদের ছোট্ট শান্ত গ্রামটির উপরে এসে পড়েছিল, আর ঐ অভিশাপে পড়ে কত মা, কত ভাই-বোন, কত ছেলেমেয়ে যে গাঁয়ের ভরাবক্ষে শুধু একটা খাঁ খাঁ মহাশূন্যতা রেখে কোন সে অচিন মুল্লুকে উধাও হয়ে গেল তা মনে পড়লে-মাগো মা—জানটা যেন সাতপাক খেয়ে মোচড় দিয়ে ওঠে। কত যে ঘর-কে-ঘর উজাড় হয়ে তাতে তালাচাবি পড়ল—আর গ্রামে যেমন এক একটি করে ভিটে নাশ হতে লাগল, তেমনি এই গোরস্থানে গোরের সংখ্যা এত বেশি বেড়ে উঠল যে, আর তার দিকে তাকানোই যেত না।

আচ্ছা ভাই, এই যে দীঘির গোরস্থান, আর এই যে হাজার হাজার কবর, এগুলো কি তবে আমাদেরই গাঁয়ের একটা নীরব মর্মন্তুদ বেদনা—অন্তঃসলিলা ফল্গুনিঃস্রাব—জমাট বেঁধে অমন গোর হয়ে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে? না কি আমাদের মাটির মা তাঁর এই পাড়াগাঁয়ে চির-দরিদ্র জরাব্যাধি প্রপীড়িত ছেলেমেয়েগুলোর দুঃখে ব্যথিত হয়ে করুণ প্রগাঢ় স্নেহে বিরামদায়িনী জননীর মতো মাটির আঁচলে ঢেকে বুকের ভিতর

লুকিয়ে রেখেছেন? তাঁর এই মাটির রাজ্যে তো দুঃখ-ক্লেশ বা কারুর অত্যাচার আসতে পারে না! এখানে শুধু একটা বিরাট অনন্ত সুপ্ত শান্তি—কর্মক্লান্ত মানবের নিঃসাড় নিস্পন্দ সুষুপ্তি! এ একটা ঘুমের দেশ, নিঝুমের রাজ্যি! আহা, আজ সে কত যুগের কত লোকই যে এই গোরস্থানে ঘুমিয়ে আছে তা এখন গাঁয়ের কেউ বলতে পারবে না। আমি আর কতজনকেই বা মরতে দেখলুম? এরা যখন মরেছিল, আমি তখন হয়তো এমনি একটা অ-দেখার 'কোকাফ মুল্লুকে' ঘুরতে ছিলুম, তারপর যখন আমায় কে এই দুনিয়ায় এনে ফেলে দিলে—আর দুনিয়ার এই আলোকের জ্বালাময় স্পর্শে আমার চক্ষু ঝলসে গেল, তখন আমি নিশ্চয় অব্যক্ত অপরিচিত ভাষায় কেঁদে উঠেছিলুম, ওগো, এ মাটির—পাথরের দুনিয়ায় কেন আমায় আনলে? কেন, ওগো কেন?—তারপর মায়ের কোলে শুয়ে যখন তাঁর দুধ খেলুম, তখন প্রাণে কেমন একটা গভীর সান্ত্বনা নেমে এল! আমি আমার সমস্ত অতীত এক পলকে ভুলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

ঐ যে বাঁধানো কবরগুলো, ওগুলো অনেক কালের পুরানো। তখন ছিল বাদশাহি আমল, আর আমাদের এই ছোট্ট গ্রামটাই ছিল 'ওলিনগর' বলে একটা মাঝারি গোছের শহর। ঐ যে সামনে 'রাজার গড়' আর 'রানির গড়' বলে দুটো ছোট্ট পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, ওতেই থাকতেন তখনকার রাজা রানি—রাজকুমার আর রাজকুমারীরা। লোকে বলে, তাঁরা শুতেন হীরার পালঙ্কে, আর খেতেন 'লাল জওয়াহের'। আর, কবরস্থানের পশ্চিম দিকে ঐ যে পির সাহেবের 'দরগা' ওরই 'বর্দোয়ায়' নাকি এমন সোনার শহর পুড়ে ঝাও হয়ে যায়। সেই সঙ্গে রাজার ঘরগুষ্টি সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আজ তাঁর বংশে বাতি দিতে কেউ নেই। পশ্চিমে-হাওয়ায় তাঁদের সেই ছাই-হওয়া দেহ উড়ে উড়ে হয়তো এই গোরস্থানের উপরই এসে পড়েছে। আচ্ছা ভাই, খোদার কি আশ্চর্য মহিমা! রাজা--যার অত ধন, মালমাত্তা, অত প্রতাপ, সেও মরে মাটি হয়! আর যে ভিখারি খেতে না পেয়ে তালপাতার কুঁড়েতে কুঁকড়ে মরে পড়ে থাকে, সেও মরে মাটি হয়। কি সুন্দর জায়গা এ তবে বোন!

তুই ঠিক বলেছিস ভাই সলিমা, কেঁদে কি হবে, আর ভেবেই বা কি হবে! যা হবার নয় তা হবে না, যা পাবার নয় তা পাব না। তবু পোড়া মন তো মানতে চায় না। এই যে একা কবরস্থানে এসে কত রাত্তির ধরে শুধু কেঁদেছি, কিন্তু এত কান্না এত ব্যাকুল আহ্বানেও তো কই তাঁর একটুকু সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি কি এতই ঘুমুচ্ছেন? কি গভীর মহানিদ্রা সে? আমার এত বুকফাটা কান্নার এত আকাশচেরা চিৎকারের এতটুকু কি তাঁর কানে গেল না? সেই কোন মায়াবীর মায়াযষ্টিস্পর্শে মোহনিদ্রায় বিভোর তিনি? আমিও কেন অমনি জড়ের মতো নিঃসাড় নিস্পন্দ হয়ে পড়ি না? আমারও প্রাণে কেন মৃত্যুর ঐ রকম শান্ত-শীতল ছোঁওয়া লাগে না? আমিও কেন দুপুর রাতের গোরস্থানের মতোই নিথর নিঝুম হয়ে পড়ি না? তাহলে তো এ প্রাণপোড়ানো অতীতটা জগদ্দল শিলার মতো এসে বুকটা চেপে ধরে না! সেই সে কোন-ভুলে-যাওয়া দিনের কুলিশ-কঠোর স্মৃতিটা তপ্ত শলাকার মতো এসে এই ক্ষত বক্ষটায় ছ্যাঁকা দেয় না! 'জোবেহ'

করা জানোয়ারের মতো আর কতদিন নিদারুণ জ্বালায় ছটফট করে মরব? কেন মৃত্যুর মাধুরী মায়ের আশিসধারার মতো আমার উপর নেমে আসে না? এ হতভাগিনীকে জ্বালিয়ে কার মঙ্গল সাধন করছেন মঙ্গলময়? তাই ভাবি—আর ভাবি,—কোনো কূলকিনারা পাই না, এর যেন আগাও নেই, গোড়াও নেই। কি ছিল—কি হলো—এ শুধু একটা বিরাট গোলমাল!

সেদিন সকালে ঐ পাশের চারাধানের ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে কাঁচা আম খেতে খেতে একটি রাখাল বালক কোথা হতে শেখা একটা করুণ গান গেয়ে যাচ্ছিল। গানটা আমার মনে নেই, তবে তার ভাবার্থটা এই রকম, 'কত নিশিদিন সকাল সন্ধ্যা গিয়ে মিশল, আবার কত সাগর শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেল, কত নদী পথ ভুলে গেল, আর সে কত গিরিই না গলে গেল, তবু ওগো বাঞ্ছিত, তুমি তো এলে না!' গানটা শুনছিলুম আর ভাবছিলুম, কি করে আমার প্রাণের ব্যাকুল কান্না এমন করে ভাষায় মূর্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করছিল? ওগো, ঠিক এই রকমই যে একটা মস্ত অসীম কাল আমার আঁখির পলকে পলকে যেন কোথা দিয়ে কোথায় চলেছে, আর আমি কাকে পাবার—কি পাবার জন্যে শুধু আকুলি-বিকুলি মিনতি করে ডাকছি, কিন্তু কই তিনি তো এলেন না—এতটুকু সাড়াও দিলেন না। তবে দুপুর রোদ্দুরে ঘুনঘুনে মাছির মুখে ঐ যে খুব মিহি করুণ 'গুন গুন' সুর শুনি এই গোরস্থানে, ওকি তাঁরই কান্না? দিনরাত ধরে সমস্ত গোরস্থান ব্যেপে প্রবল বায়ুর ঐ যে একটানা হু হু শব্দ, ওকি তাঁরই দীর্ঘশ্বাস? রাত্তিরে শিরীষ ফুলের পরাগমাখা ঐ যে ভেসে আসে ভারি গন্ধ, ওকি তাঁরই বর-অঙ্গের সুবাস? গোরস্থানের সমস্ত শিরীষ, শেফালি আর হেনার গাছগুলো ভিজিয়ে, সবুজ দুর্বা আর নীল ভুঁই-কদমের গাছগুলোকে আর্দ্র করে ঐ যে সন্ধে হতে সকাল পর্যন্ত শিশির ক্ষরে, ওকি তাঁরই গলিত বেদনা? বিজুলির চমকে ঐ যে তীব্র আলোকচ্ছটা চোখ ঝলসিয়ে দেয়, ওকি তাঁরই বিচ্ছেদ-উন্মাদ হাসি? সৌদামিনী-স্ফুরণের একটু পরেই ঐ যে মেঘের গম্ভীর গুরু গুরু ডাক শুনতে পাই, ওকি তার পাষাণ বক্ষে স্পন্দন? প্রবল ঝন্‌ঝার মতো এসে সময় সময় ঐ যে দমকা বাতাস আমাকে ঘিরে তাণ্ডব নৃত্য করতে থাকে, ওকি তাঁরই অশরীরী ব্যাকুল আলিঙ্গন? গোরস্থানের পাশ দিয়ে ঐ যে 'কুনুর' নদী বয়ে যাচ্ছে, আর তার চরের উপর প্রস্ফুটিত শুভ্র কাশফুলের বনে বনে দোল-দোলা দিয়ে ঘন বাতাস শন শন করে ডেকে যাচ্ছে, ওকি তাঁরই কম্পিত কণ্ঠের আহ্বান? আমি কেন ওঁরই মতো অমনি অসীম, অমনি বিরাট ব্যাপ্ত হয়ে ওঁকে পাই না? আমি কেন অমনি সবারই মাঝে থেকে ঐ অ-পাওয়াকে অন্তরে অন্তরে অনুভব করি না? এ সীমার মাঝে অসীমের সুর বেজে উঠবে সে আর কখন? এখন যেদিন শেষ হয়ে এল, ঐ শোনো নদীপারের বিদায়-গীত শোনা যাচ্ছে খেয়াপারের ক্লান্ত মাঝির মুখে—

'দিবস যদি সাঙ্গ হলো, না যদি গাহে পাখি,
ক্লান্ত বায়ু না যদি আর চলে,
এবার তবে গভীর করে ফেলোগো মোরে ঢাকি
অতি নিবিড় ঘন তিমির তলে!'

[খ]

এই যে গোরস্থান, যেখানে আমার জীবনসর্বস্ব দেবতা শুয়ে রয়েছেন, শৈশব হতে এই জায়গাটাই ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় স্থান। ঐ যে অদূরে ছোট ছোট তিনটি কবর দেখতে পাচ্ছু প্রায়ই মাটির সঙ্গে মিশে সমান হয়ে গেছে, আর উপরটা কচি দুর্বা ঘাসে ছেয়ে ফেলেছে, ওগুলি আমার ছোট ভাই-বোনদের কবর! ওরা খুব ছোটতেই মারা গিয়েছিল—আমের কচি বৌল ফাগুনের নিষ্ঠুর করকাস্পর্শে ঝরে পড়েছিল। ওই যে ওদের শিয়রে বকম ফুলের গাছগুলি দেখতে পাচ্ছ, ওগুলি আমিই লাগিয়েছিলুম, আমি তখন খুবই ছোট। এখন আয়তনে রোয়ানো ঝোঁপ আর আলগা লতায় ও জায়গাটা ভরে উঠেছে। আগে ওদের কবরের উপর ওদেরই মতো কোমল আর পবিত্র বকম ও শিরীষ ফুলের হলদে রেণু ঝরে পড়ত সারা বসন্ত আর শরৎকালটা ধরে, আর তার চেয়ে বেশি ঝরে পড়ত ঐ তিনটি ক্ষুদ্র সঙ্গীদের বিচ্ছেদ-ব্যথিত অন্তর-দরিয়া মথিত করে আকুল অশ্রুর পাগল-ঝোরা! বাবা আমার মাকে ধরে ধরে নিদাঘের বিষাদ গভীর সন্ধ্যায় এই সরু পথ বেয়ে নিয়ে যেতেন, আর আমাদের 'টুনু'র, 'তাহেরা'র আর 'আবুলে'র ঘাসে চাপা ছোট কবরগুলি দেখিয়ে বলতেন, 'এইখানে তারা ঘুমিয়ে আছে, তারা আর উঠে আসতে পারে না। অনেক দিন বাদে আমরাও সব এসে ওদেরই পাশে শোবো,—আমাদের অমনি মাটির ঘর তৈরি করে দেবে গাঁয়ের লোকে।' সেই সময় সেই বেদনাপ্লুত বিয়োগ-বিধুর সন্ধ্যায় কি একটা আবছায়া আবেশ করুণ সুরে যে আমার সারা বক্ষ ছেয়ে ফেলত, তা প্রকাশ করতে পারতুম না, তাই বাবার মুখের দিকে চেয়ে কি জানি কেন ডুকরে কেঁদে উঠতুম। বাবা অপ্রতিভ হয়ে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে তাঁর স্নিগ্ধ-কোমল স্পর্শে সান্ত্বনা দিতেন। সেই থেকে জায়গাটার উপর আমার এত মায়া জন্মে গেছিল যে, আমি রোজ মাকে লুকিয়ে এখানে পালিয়ে এসে আমার ভাই-বোনদের ঐ ছোট্ট তিনটি কবরের দিকে ব্যাকুল বেদনায় চেয়ে থাকতুম!—আচ্ছা ভাই, রক্তের টান কি এত বেশি? যেখানে আমার কচি ভাই-বোনগুলির ফুলের দেহ মাটির সঙ্গে মিশে মাটি হয়ে গেছে, সেই ভীষণ করুণ জায়গাটি দেখবার জন্যেও প্রাণে এমন ব্যাকুল আগ্রহ উপস্থিত হতো কেন? শুনেছি যে-জায়গাটার মাটি নিয়ে খোদা আমাদের 'পয়দা' করেন, নাকি ঠিক সেই জায়গাতেই আমাদের কবর হয়, আর তাই আমরা স্বতই কেমন একটা নিবিড় টান অন্তরের অন্তরে অনুভব করি। এখন 'তাহেরা'র কবরটি যেমন ধসে পড়েছে আর ওর মধ্যে একটি ধলা হাড় দেখা যাচ্ছে, হয়তো সে কত বছর বাদে আমারও কবর এরকম ধসে যাবে আর আমার বিশ্রী হাড়গুলো উলঙ্গ মূর্তিতে প্রকট হয়ে লোকের ভয়োৎপাদন করবে!—হায় রে মানুষের পরিণতি, তবু মানুষ এত অহঙ্কার করে কেন আমি তাই ভাবি—আর ভাবি। আবার দু-এক সময় মনে হয়, সুন্দর পৃথিবীটা ছেড়ে সে কোন অজানা দেশে চলে যেতে হবে। মনে হলে জানটা যেন গুরুবেদনায় টনটন করে ওঠে, পৃথিবীর প্রতি একি অন্ধ মূঢ় নাড়ির টান আমাদের? তারপর বাবাও 'আবুলে'র পাশে গিয়ে শয়ন করলেন, বড় ঝোপের পাশের ঐ বড় কবরটা বাবার। বাবা

মরে যাবার পর আমি আরো বেশি করে কবরস্থানে যেতুম, স্তব্ধ হয়ে বসে রইতুম আমার হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের মৌন সাদরের ভাষা শুনব বলে ; একটা নিবিড় বেদনায় চোখের পাতা ভরে উঠত।

এই সব বেদনা, অপমান, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে মা আমার দিন দিন রুগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। উপর্যুপরি এত আঘাত তিনি আর সইতে পারছিলেন না। ক্রমে তাঁকে ভীষণ যক্ষ্মারোগে ধরল। আমি বুঝলুম আমার কপাল পুড়েছে, মাও আমায় ছেড়ে চলেছেন, তাঁর ডাক পড়েছে। আমি আমার ভবিষ্যতের দিকে তাকাতেও সাহস করলুম না,—উঃ সে কি সূচিভেদ্য অন্ধকার !

এমন সময় একদিন সন্ধ্যায় সই-মা আমাদের ঘরে এসে মার শীর্ণ হাতটি নিজের হাতে নিয়ে বললেন, 'সই, আমার ছেলে গরমের ছুটিতে বাড়ি এসেছে। সে তোদের দোওয়াতে এবার খুব সম্মানের সঙ্গে বি.এ. পাশ করেছে। এবার ছেলের বিয়েটা দিয়ে বৌটিকে সংসার বুঝিয়ে দিয়ে সংসার হতে সরে পড়ি। আর তা ছাড়া একা ঘর, বৌ নেই, বেটি নেই, দিন রাত ঘরটা যেন পোড়াবাড়ির মতো খাঁ খাঁ করছে। খোদা তো দেননি আমায় যে, দুদিন জামাই-বেটি নিয়ে সাধ-আহ্লাদ করব। ছেলে এতদিন জেদ ধরেছিল বি.এ. পাশ করে বিয়ে। তা খোদা তার ইচ্ছা পূর্ণ করে দিয়েছেন। এতদিন আমার ছেলে বে' করলে দু-একটি খোকা খুকি হতো না কি তার ঘরে। আর আমারও ঘরটা তাহলে অনেক মানাতো, তা যখনকার তখন না হলে তোর আমার কথায় তো কিছু হয় না। আমার হাতের কাছে লক্ষ্মী শান্ত মা আমার—হীরের টুকরো বৌ থাকতে আবার কোন গরিবের বেটিকে আনতে যাব ঘরে,' বলেই আমার মাথাটা সস্নেহে তাঁর বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। মা আর আমি বোকার মতো শুধু অবাক বিস্ময়ে সইমার দিকে চেয়েছিলুম, একি পাগলের মতো তিনি বলে যাচ্ছিলেন। মার দুর্বল বক্ষ স্পন্দিত করে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল। সইমা মায়ের বুকে খানিকটা মালিশ নিয়ে মালিশ করে দিতে দিতে তেমনি সহজভাবে বলে যেতে লাগলেন, 'আমার ছেলের উপর বরাবরই বিশ্বাস আছে, সে কখনো যে আমার একটি কথা অমান্য করেনি। যেমন বললুম, ওরে আজিজ, তোর সইমা যে তোর শাশুড়ি হবে রে, 'বেগম'কে আমার বৌ করে ঘরে আনতে চাই, তোর বৌ পছন্দ হবে তো আবার ! আজকাল তো বাবা তোরা মা বাপের পছন্দে বে' করিস না কি না, তাই !'—আমাকে আর বেশি বলতে হলো না, সে খুব খুশি হয়েই বললে, 'বেশ তো মা-জান, তোমার কথার তো আর কখনো অবাধ্য হইনি, আর তুমি যে আমায় কোনো জমিদার বাড়িতে বে না দিয়ে একটি অনাথা গরিবের মেয়েকে উদ্ধার করতে যাচ্ছ, এতে আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে, দুনিয়ার লোককে জড়ো করে দেখাই আমার মায়ের মতো উঁচু মন আর কার আছে !' আজিজ আমার জনম-পাগলা মা-নেওটা ছেলে কি না, আর সে যে আবদার ধরেছে যখন, তখনই তাই পূর্ণ করেছি কিনা, তাই ওর চোখে আমার মতো মা নাকি আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পাওয়া যায় না ! সে যাক এখন বোন, আমি আজই বেগমকে দোওয়া করে যাব, কেননা হায়াত মউত জানি না, কখন কি

হয় বলা তো যায় না—তোর আবার এই রকম খাটে মাদুরে অবস্থা। আমি মনে করছি এই মাসের মধ্যেই ব্যাটার বৌকে বরণ করে ঘরে তুলি, শুভকাজে বিলম্ব করা ভালো নয়, আর তাতে গ্রামের অনেকে অনর্থক কতকগুলো বাধা বিপত্তি করবে, সই! মা বেগম আমার শূন্যপুরী পূর্ণ করুক যেয়ে।' সই-মা আর কি বলেছিলেন ঠিক মনে নাই, কেননা আমার মাথা তখন বন বন করে ঘুরছিল, মস্তিষ্কের ভিতর কি একটা তীব্র উত্তেজনা ঘুরপাক খাচ্ছিল,—একটা হঠাৎ পাওয়া নিবিড়-বেদনাময় আনন্দের আঘাতে কে যেন আমার সমস্ত শরীর নিশা করে দিচ্ছিল।

[গ]

খুব ধুমধামে আমাদের বে' হয়ে গেল। ধুমধাম মানে 'আতস-বাজি', 'বাজনা', 'বাইনাচ', 'থিয়েটার' প্রভৃতি যে-সকল অসাধু কলুষ আনন্দের কথা বোঝো তোমরা, তার কিছুই হয়নি। আর যদি ধুমধাম মানে নির্দোষ পবিত্র আনন্দের বিনিময় বোঝায়, তাহলে তার কোথাও এতটুকু ত্রুটি ছিল না। গ্রামের সমস্ত গরিব দুঃখীকে সাতদিন ধরে সুন্দররূপে ভালো ভালো খাবার খাওয়ানো হয়েছিল? অনেকের পুরানো ঘর নূতন করে দেওয়া হয়েছিল। যাদের হালের গরু না থাকায় সমস্ত জমিজমা পতিত হয়েছিল, তাদিগকে গরু কিনে দেওয়া হয়েছিল। গ্রামের তাঁতি দু ঘরকে দুটি তাঁতের কল কিনে দিয়ে তাগিদকে গরু কিনে দেওয়া হয়েছিল। গ্রামের তাঁতি দুঘরকে দুটি তাঁতের কল কিনে দিয়ে তাদিগকে দেশি কাপড় বোনায় উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। কলকাতার এতিমখানায় পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। সে-সব আরও কত জায়গায় কত টাকা দিয়েছিলেন যে মা, তা আমার এখন সব মনে নেই!

সই-মা আমায় বধূ করে যত খুশি হয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃখিত হয়েছিল গ্রামের লোকেরা, আর ওঁর আত্মীয় কুটুম্বেরা। ওঁদের অনেক আত্মীয় ছোট ঘরে বে' দেওয়ার জন্যে বে'র নিমন্ত্রণে একেবারেই আসেনি। এমনকি এই নিয়ে অনেকের সঙ্গে চিরদিনের জন্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছিল। অনেক হিতৈষী মিত্রও শত্রু হয়ে দাঁড়াল। তবে পয়সার খাতির সব জায়গাতেই, তাই অনেক চতুর মাতব্বর লোক এঁদের সঙ্গে মৌখিক সদ্ভাব রেখে ভিতরে ভিতরে অনিষ্ট করতে লাগল। সমাজে পতিত না হলেও বিশেষ কাজ বনাম স্বার্থ ছাড়া আর কেউ এ-বাড়ি আসত না। কিন্তু যে সব সহায়হীন গরিব বেচারারা জন্মাবধি এ বাড়ির সাহায্যে প্রতিপালিত হয়ে এসেছে, তারা সমাজের এ চোখ রাঙানি দেখে শুধু উপরে উপরে ভয় করে চলত। তারা জানত, সমাজ শুধু চোখ রাঙাতেই জানে। যে যত দুর্বল তার তত জোরে টুঁটি চেপে ধরতেই সমাজ ওস্তাদ। যেখানে উল্টো সমাজকেই চোখ রাঙিয়ে চলবার মতো শক্তিসামর্থ্যওয়ালা লোক বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে সমাজ নিতান্ত শান্তশিষ্টের মতোই তার সকল অনাচার আবদার বলে সয়ে নিয়ে থাকে। তাই উনি আর ওঁর মা বললেন, 'আমাদের

সমাজই নাই তো সমাজচ্যুত করবে কে?'—সমাজ তবুও সুবোধ শিশুর মতো কোনো সাড়াই দিলে না, কিন্তু ওঁদের বাড়িতে যেসব গরিব বেচারারা আসত তাদিগকে খুব কড়াভাবেই শাসন করা হলো, যেন কেউ ওঁদের বাড়ির ছায়াও না মাড়ায়।

লোকের এরূপ ব্যবহারে আদৌ দুঃখিত না হয়ে ওঁরা বরং হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাছাড়া গ্রামের দরিদ্রের সেই আনন্দোদ্ভাসিত মুখে, অশ্রু ছলছল চোখে যে একটা মধুর স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠেছিল, তারই জ্যোতি ওদের হৃদয় আলোয় আলোময় করে দিয়েছিল; উল্টো দিকে পরশ্রীকাতর লোকদের চোখ মুখ ভয়ানকভাবে ঝলসে দিয়েছিল!

ওঃ, সে কি অমানুষিক শক্তি ছেয়ে ফেলেছিল মায়ের ঐ ঝাঁঝরা বুক আমার বিদায়ের দিনে! মায়ের আনন্দের আকুল ধারা যেন কোথাও ধরছিল না সেদিন! হাজার কাজের ভিতর হাসির মাঝে অকারণে অশ্রু উথলে পড়ছিল তাঁর।

আমার জীবন কিন্তু সার্থকতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সেইদিন—যেদিন বুঝলুম আমার হৃদয়-দেবতাও তাঁর মাতৃদত্ত আশীর্বাদ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছেন, আমার প্রাণের গোপন পূজা আরাধ্য দেবতার পায়ে বৃথা নিবেদিত হয় নাই!

আমার শুধু ইচ্ছা হতো আমি তাঁর পায়ে মাথা কুটি আর বলি, 'ওগো স্বামিন! ওগো দেবতা! এত আনন্দ দিয়ো না এ ক্ষুধিতাকে, প্রেমের এত আকাশ-ভাঙা ঘন বৃষ্টি ঢেলে দিও না এ চিরমরুময় হৃদয়ে,—সকল মন দেহ প্রাণ ছেয়ে ফেলো না তোমার ও ব্যাকুল ভালবাসার ব্যগ্র নিবিড় আলিঙ্গনে! আমার ছোট্ট বুক যে এত আনন্দ, এত ভালবাসা সইতে পারবে না!—কিন্তু হায়, তাঁর ও ভুজবন্ধনে ধরা দিয়ে আমার আর কিছুই থাকত না, আমি আমার বর্তমান ভূত ভবিষ্যৎ ভুলে যেতুম! এ যেন স্বপ্নে পরিস্থানে গিয়ে প্রিয়তমের অধীর বক্ষে মাথা রেখে সুপ্ত বধির হয়ে যাওয়া, প্রাণের সকল স্পন্দন, দেহের সমস্ত রুধির অবাক স্তব্ধ হয়ে থেমে যাওয়া,—শুধু তুমি আর আমি—অনুভব করা, সে-কোন অসীম সিন্ধুতে বিন্দুর মতো মিশে যাওয়া!

তাঁর ঐ বিশ্বগ্রাসী ভালবাসা যখন চোখের কালোয় জ্যোতির মতো হয়ে ফুটে উঠত, তখন শুধু ভাবতুম প্রেমে মানুষ কত উচ্চ হতে পারে! এর এতটুকু ছোঁয়ায় সে কি কোমলতার স্নিগ্ধ পূত সুরধুনী বয়ে যায় সারা বিশ্বের অন্তরের অন্তর দিয়ে। দেবতা বলে কি কোনো কথা আছে? কখখনো না। মানুষই যখন এই রকম উচ্চ হতে পারে, অতল ভালবাসায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তলিয়ে দিতে পারে, নিজের অস্তিত্ব বলে কোনো কিছু একটা মনে থাকে না—সে দেখে, সব সুন্দর আর আনন্দ, তখনই মানুষ দেবতা হয়! দেবতা বলে কোনো আলাদা জীব নাই।

* * *

যাক ও-সব কথা এখন—কি বলছিলুম?—হাঁ, আমার বিয়ের মতো এত বড় একটা অস্বাভাবিক কাণ্ডে গ্রামময় মহা হুলুস্থুল পড়ে গেল। বংশে নিকৃষ্ট, সহায়সম্বলহীন

আমাদের ঘরে সৈয়দ-বংশের বি.এ. পাশ করা সোনার চাঁদ ছেলের বিয়ে হওয়া ঠিক যেন রূপকথার ঘুঁটে-কুড়োনির বেটির সাথে বাদশাজাদার বিয়ের মতোই ভয়ানক আশ্চর্য ঠেকছিল সকলের চোখে! গ্রামের মেয়েরা তো অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়েছিল, 'বাপরে বাপ, মেয়েটার কি পাঁচপুয়া কপাল!' তারা এও বলতে কসুর করেনি যে, আমি আবাগি নাকি রূপের ফাঁদ পেতে অমন নিষ্কলঙ্ক চাঁদকে বেমালুম কয়েদ করে ফেলেছিলুম? এও বলেও যখন তারা একটুও ক্লান্ত হলো না, তখন সবাই একবাক্যে বলে বেড়াতে লাগল যে, বুনিয়াদি খান্দানে এমন একটা খটকা, এও কি কখনো সয়? এত বাড়াবাড়ি সইবে না, সইবে না। কখন আমাদের কপাল পুড়ে আর তাদের দশজনের ঐ মহাবাক্যটা দৈব-বাণীর মতো ফলে যায়, তাই আলোচনা করে করে তাদের আর পেটের ভাত হজম হতো না। আমার কিন্তু তখন কিছুই শুনবার আগ্রহ ছিল না—যে-দেবতা এমন করে তাঁর পরশমণির স্পর্শে আমার সকল ভুবন এমন সোনা করে দিয়েছিলেন, যাঁর মাঝে আমার সকল সত্তা, সব আকাঙ্ক্ষা চাওয়া-পাওয়া একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিল, আমি সব ভুলে গিয়ে শুধু সেই দেবতাকেই নিত্য নূতন করে দেখছিলুম। তখন যে আমার ভাববার আর বলবার কিছুই ছিল না। তখন যে 'সব পেয়েছি'র আসরে আনন্দময় হয়ে যাবার মাহেন্দ্রক্ষণ! কিন্তু হায়, কালের অত্যাচারে সে মাহেন্দ্রক্ষণ আসবার আগেই এই সুন্দর বিশ্বের সে কি শক্ত দিকটা চোখে পড়ে গেল। প্রাণে বিরাট শান্তি নেমে আসবার আগেই সে কি গোলমাল হয়ে গেল সব। আগে হতেই আমার প্রাণের নিভৃততম দেশে সে কি এক আশঙ্কা যেন শিঁউরে শিউরে উঠত! মনে হতো যেন এত সুখের পিছনে সে কি বজ্র ওৎ পেতে রয়েছে। কখন আমার এ আকাশ-কুসুম ভেঙে যাবে!—মনে হতো এ ক্ষণিকের পাওয়া যেন একটি রজনীর স্বপ্নে পাওয়া ছোট্ট এক টুকরা আনন্দ, স্বপ্ন ভেঙে গেলেই তেমনি ঘুটঘুটে অন্ধকার!

মা আমায় সম্প্রদান করেই আবার শয্যা আশ্রয় করেছিলেন, তাঁর যে তখন আর চাইবার বা করবার কিছুই ছিল না, তখন যে মা মুক্ত! তাই তিনিও আমায় সইমার হাতে দিয়ে যে দেশের কেউ খবর দিতে পারে না সেই কোন অজানার দেশে চলে গেলেন। বোধ হয় সেখানে আমার বাবা খোকাখুকিদের নিয়ে অশ্রুসজল নয়নে পথের দিকে চেয়েছিলেন। যাবার সময় সে কি তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছিল মার পাণ্ডুর ওষ্ঠপুটে! আমি যখন মার বুকে আছাড় খেয়ে কেঁদে উঠলুম, 'মা গো যেয়ো না—আমার যে আর দুনিয়ায় কেউ নেই মা, তখন মা আমার মুখে হাত দিয়ে বলেছিলেন, 'বলিসনে বলিসনে রে অমন কথা বেগম, তোর অভাব কিসের? এমন মায়ের চেয়েও স্নেহময়ী শাশুড়ি, দেবতার চেয়েও উচ্চ স্বামী, এত পেয়েও রাক্ষুসী বলছিস কিছু নেই তোর? ছি মা, বলিসনে অমন অপয়া কথা!

মাকে বাবার পাশেই গোর দেওয়া হলো। আজ তাহেরার আর আবুলের কবর যেমন ধুলার সঙ্গে মিশে গিয়েছে, দুদিন বাদে মারও কবর অমনি সমান হয়ে মিশে যাবে, কিন্তু আমার বুকে পুঞ্জীভূত বেদনার এই যে একটা শক্ত গেরো বেঁধে গেল, সে কি মিশাবে কখনো?

এরপর হতে এই সব উপর্যুপরি শোকের আঘাতে আমায় মারাত্মক মূর্ছারোগে ধরলে! প্রায়ই আমি অচেতন হয়ে পড়তুম, আর যখনই চেতন হতো তখনি দেখতুম আমার ধূলিধূসরিত শির রয়েছে তাঁর—আমার স্বামীর ঘনস্পন্দিত বিশাল বক্ষে,—তাঁর সব-ভুলানো ব্যাকুল বাহু-বন্ধনের মাঝে। ওঃ, সে কি ভীত করুণাঘন দৃষ্টি তাঁর চোখে ফুটে উঠত! সহানুভূতির সে কি কোমল স্নিগ্ধছায়া ছেয়ে ফেলত তাঁর স্বভাব-সুন্দর মুখখানি!—আমার তখন মনে হতো এর চেয়ে মেয়েদের কি আর সুখ থাকতে পারে? এর চেয়ে আকাঙ্ক্ষিত ঈপ্সিত কি সে অপার্থিব জিনিস চাইতে পারে আমাদের মন্দভাগিনী স্ত্রীজাতিরা? হায়, সে সময়ে স্বামীর কোলে অমনি করে মাথা রেখে কেন আমার শেষ নিশ্বাসটুকু বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়নি?

[ঘ]

এখন বলছি বোন তোকে আমার কাহিনীটা, এও যে একটা 'কেসসা'। কে আমার এ কথা বিশ্বাস করবে আর কেই বা শুনবে? তার উপর নাকি আমার মগজ বিগড়ে গিয়েছে, আর তাই মাঝে মাঝে আমি খুব শক্ত 'বক্তিমা ঝেড়ে আমার বিদ্যা জাহির করি। আমার এই বকরবকর করাটা কেউ পছন্দ করে না, তাই একটু শুনেই বিরক্ত হয়ে চলে যায়। আচ্ছা বোন বল তো মেয়েমানুষে আবার কবে কথা গুছিয়ে বলতে পেরেছে, আর খুব বেশি বলাই মেয়েদের স্বভাব কি না! আমি কম কথায় কি করে আমার সকল কথা জানাব? তাই হয়তো বলবি, কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়েছে তোর কথা বলবার জন্যে? তাও বটে, তবে পেটের কথা, বুকের ব্যথা লোককে না জানালেও যে জানটা কেমন শুধু আনচান করে, বুকটা ভারি হয়ে ওঠে, এও তো একটা মস্ত জইর 'গজর্ব'।

* * *

সইমা এত বড় রাশভারি লোক ছিলেন যে সবাই তাঁকে ভয় করে চলত। তিনিই ছিলেন ঘরের মালিক। কেউ তার কথার 'টুঁটি করতে পারত না। তাই এত বড় একটা অঘটন,—আমার মতো পাতাকুড়ুনির বেটিকে রাজবধূ করা সত্ত্বেও মুখ ফুটে কেউ আর কিছু বলতে পারল না তেমন। মেয়েরা প্রকারান্তরে আমার নিচু ঘরের কথা জানতে এলে তিনি জোর গলায় বলতেন, 'জাত নিয়ে কি ধুয়ে খাব? আর জাত লোকের গায়ে লেখা থাকে? যার চালচলন শরিফের মতো সেই তো আশরাফ। খোদা কিয়ামতের দিনে কখখনো এমন বলবেন না যে, তুমি সৈয়দ সাহেব, তোমার সব 'সওয়াব' (পুণ্য) বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে, কাজেই তোমার কপালে তো জাহান্নাম ধরাবাঁধা! আমি চাই শুধু গুণ, তা সে যে জাতই হোক না কেন। দেখুক তো এসে আমার বৌকে—ঘর আলো করা রূপ, আশরাফের চেয়েও আদব তমিজ, লেখাপড়া জানা, কাজকর্মে পাকা এমন লক্ষ্মী বৌ আর কার আছে! আর কি জন্যেই বা বড় ঘরের বেটিকে ঘরে আনব, সে যত না আনবে রূপ-গুণ,

তার চেয়ে বেশি আনবে বাপমায়ের গরব আর অশান্তি ! আমার এই সোনার চাঁদ ছেলে বেঁচে থাক, ওর ঘরে ছেলেপিলে দেখি, তাহলেই আমি হাসতে হাসতে মরব।' মায়ের সেই স্নেহভেজা কথায় যে কতই আনন্দে বুক ভরে উঠত ! আমার চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়ত। কৃতজ্ঞতা আর ভক্তির ভাষা বুঝি মর্মের অশ্রু !

স্বামীর সত্যিকারের ভালবাসা আর সইমার মেয়ের চেয়েও নিবিড় স্নেহ আমার তো আর কিছুই অপূর্ণ রাখেনি। দুনিয়ায় যখন যা দেখতুম তাই সব যেন সুন্দর হয়ে ফুটে উঠত। কই, ওর আগে তো এই মাটির দুনিয়াকে এত সুন্দর করে দেখিনি। ভালবাসার অঞ্জন কি মহিমা জানে, যাতে সব অসুন্দর অত সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে !

এত সুখ, তবুও পোড়া মন কেন আপনাআপনিই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ত। পাড়া-পড়শি লোকের ঐ একটা কথাই যেন শাখচিল্লির মতো কানের কাছে এসে বাজত, সইবে না, সবইবে না ! 'চোরের মন বোঁচকার দিকে, তাই আমার মত হতভাগীর মনে যে শুধুই অমঙ্গলের বাঁশি বাজবে, তাতে আর আশ্চর্য কি !—ঐ অত গভীর ভালবাসার আঘাতই যে আমাকে বিব্রত করে তুলেছিল ! মধু খুবই মিষ্টি, কিন্তু বেশি খাওয়ালেই গা জ্বালা করে। তাই আমার মনে হতো ওঁদের পায়ে মাথা কুটে বলি, 'ওগো দেবতা, ওগো স্বর্গের দেবী, তোমরা এত স্নেহ এত ভালবাসা দিয়ে ছেয়ে ফেলো না আমায়, আমি যে আর সইতে পারছি না ! স্নেহের ঘায়ে যে আমার হৃদয় ভেঙে পড়ল ! একটু ঘৃণা করো, খারাপ বলো, আমায় খুব ব্যথা দাও, তা নইলে আমার বক্ষ নুয়ে যাবে যে !' আর অমনি আবার সেই ভীষণ মূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠত 'সইবে না'।

এমনি করে, দেখতে দেখতে দুটো বছর কোথায় দিয়ে যে কোথায় চলে গেল, তা জানতে পারলুম না। এমন সময় ঐ যে প্রথমে বলেছিলুম, কলেরা আর বসন্ত জোট করে রাক্ষসের মতো হাঁ করে আমাদের গ্রামটা গ্রাস করে ফেললে। তাদের উদর যেন আর কিছুতেই পুরতে চায় না। সে কি ভীষণ বুভুক্ষা নিয়ে এসেছিল তারা ! সমস্ত গ্রামটা যেন গোরস্থানেরই মতো খাঁ খাঁ করতে লাগল। গ্রামের সকলে যে যেদিক পারলে মৃত্যুকে এড়িয়ে ছুটল। ভেড়ার দলে যখন নেকড়ে বাঘ প্রবেশ করে তখন সমস্ত ভেড়া একসঙ্গে জুটে চারিদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে চক্ষু বুঁজে মাথা গুঁজে থাকে, মনে করে তাদের কেউ দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু মানুষ যারা, তারা তো আর মানুষকে এমন অবস্থায় ফেলে যেতে পারে না। তাঁদের একই রক্ত-মাংসের শরীর, তবে ভিতরে কোন কিছু একটা বোধ হয় বড় জিনিস থাকবে। সবারই সঙ্গে সমান দুঃখে দুঃখী, সবারই দুঃখ-ক্লেশের ভাগ নিজের ঘাড়ে খুব বেশি করে চাপানোতেই ওদের আনন্দ। ঐ বুঝি তাঁদের মুক্তি।

যখন সবাই চলে গেল গ্রাম ছেড়ে, তখন গেলুম না কেবল আমরা ; উনি বললেন, 'মৃত্যু নাই, এরূপ দেশ কোথা যে গিয়ে লুকুব ?' সবাই যখন মহামারির ভয়ে রাস্তায় চলা পর্যন্ত বন্ধ করে দিলে তখন কোমর বেঁধে উনি পথে বেরিয়ে পড়লেন, 'এই তো আমার কাজ আমায় ডাক দিয়েছে।' সে কি হাসি মুখে আর্তের সেবার ভার নিলেন তিনি। তখন তিনি এম. এ. পাশ করে আইন পড়ছিলেন। কলকাতায় খুব গরম পড়াতে দেশে এসেছিলেন। কি গরীয়সী শক্তির শ্রী ফুটে উঠেছিল তাঁর প্রতিভা-উজ্জ্বল মুখে সেদিন।

আবার সেই বাণী, 'সইবে না, সইবে না।'

দিন নেই, রাত নেই, খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, আর্তের চেয়ে অধীর হয়ে তিনি ছুটে বেড়াতে লাগলেন কলেরা আর বসন্ত রোগী নিয়ে। আমি পায়ে ধরে বললুম, 'ওগো দেবতা! থামো থামো, তুমি অনেকের হতে পারো, কিন্তু আমার যে আর কেউ নেই। ওগো আমার অবলম্বন, থামো থামো।' হায়, যাঁকে চলায় পেয়েছে তাঁকে আর থামায় কে? বিশ্বের কল্যাণের জন্য ছুটছিল তাঁর প্রাণ। তাঁর সে দুনিয়াভরা বিছানো প্রাণে আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণের কান্নার স্পন্দন ধ্বনিত হতো কি? যদিও হতো তবে সে শুধু ছুঁয়ে যেত, নুয়ে যেত না।

যে অমঙ্গলের একটু আভাস আমার অন্তরের নিভৃততম কোণে লুকিয়ে থেকে আমার সারা বক্ষ শঙ্কাকুল করে তুলেছিল, সেই ছোট্ট ছায়া যেন সেদিন কায়া হয়ে আমার চোখের সামনে বিকট মূর্তিতে এসে দাঁড়াল। সে কি বিশ্রী চেহারা তার!

মা কখনো ওঁর কাজে বাধা দেননি। শুধু একদিন সাঁঝের নামাজ শেষে অশ্রু-ছলছল চোখে তাঁর শ্রেষ্ঠধন একমাত্র পুত্রকে খোদার রাহায় উৎসর্গ করে গিয়েছিলেন। ওঃ, ত্যাগের মহিমায়, বিজয়ের ভাস্বর-জ্যোতিতে কি আলোময় হয়ে উঠেছিল তাঁর সেই অশ্রুস্নাত মুখ সেদিন! মনে হলো যেন শত ধারায় খোদার আশিস অযুত পাগলাঝোরার বেগে মায়ের শিরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমারও বক্ষ একটা মূঢ় বেদনা-মাখা গৌরবে যেন উথলে পড়ছিল।

এই রকম লোককেই দেবতা বলে,—না?

[৬]

সেদিন সকাল হতেই আমার ডান চোখটা নাচতে লাগল, বাড়ির পিছনে অশ্বত্থ গাছটায় একটা প্যাঁচা দিন দুপুরেই তিন তিন বার ডেকে উঠল, মাথার উপর একটা কালো টিকটিকি অনবরত টিক টিক করে আমার মনটাকে আরো অস্থির চঞ্চল করে তুলছিল। আমার অদৃষ্টের সঙ্গে ওদের কি সংযোগ ছিল?

উনি সেই যে ভোরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন একটা লাশ কাঁধে করে নিয়ে, সারাদিন আর ফেরেননি। আমি কেবল ঘর আর বার করেছিলুম।

বিকালবেলায় খুব ঘনঘটা করে মেঘ এল, সঙ্গে সঙ্গে তুমুল ঝড় আর বৃষ্টি সে যেন মস্ত দুটো শক্তির দ্বন্দ্বযুদ্ধ! ওঃ এত জল আর পাথরও ছিল সেদিনকার মেঘে! সামনে বিশ হাত দূরে বজ্র পড়ার মতো কি একটা মস্ত কঠোর আওয়াজ শুনে আমার মাথা ঘুরে গেল, আমি অচেতন হয়ে পড়ে গেলুম।

* * *

যখন চেতন হলো, তখন বাড়িময় একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে, চারিদিকে হাহাকার, আর জল পড়ার শব্দ ঝম ঝম। একটা মস্ত বড় বজ্র ঠিক আমার কপাল লক্ষ্য করে ছুটে আসছে!

আমার স্বামীদেবতা তখন বিছানায় শুয়ে ছটফট করছেন, আর মা পাষাণ-প্রতিমার মতো তাঁর দিকে শুধু চেয়ে রয়েছেন। চোখে এক ফোঁটা অশ্রু জমাট বেঁধে গেছে। দৃষ্টিতে কি এক যেন অতীন্দ্রিয় ঔজ্জ্বল্য। সে কি বিরাট নির্ভয়তা।

শুনলুম সেদিন আমাদের পাশের গাঁয়ের দশ বারো জন কলেরা রোগীকে গোর দিয়ে কয়েক জনকে ঔষধ পথ্য দিয়ে উনি বাড়ি ফিরছিলেন। পথে তাঁকে ঐ রোগে আক্রমণ করলে। একটা পুরানো বটগাছের তলায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, একটু আগে উঠিয়ে আনা হয়েছে।—আবার বৃষ্টি এল, সমস্ত আকাশ ভেঙে ঝম ঝম ঝম! ...

তাঁকে ধরে রাখবার ক্ষমতা আর কারুর ছিল না—তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেছিল, আর থাকবেন কেন? তিনি চলে গেলেন! যার যতটা ইচ্ছে গেল, কাঁদলে। আমাদের ঘরের আঙিনার নিমগাছটার পাতা ঝরে পড়ল, ঝর ঝর ঝর! গোয়ালের গরু দড়ি ছিঁড়ে গোঙাতে গোঙাতে ছুটল। দ্বারে কাকাতুয়াটি শুধু একবার একটা বিকট চিৎকার করে অসাড় হয়ে নিচের দিকে মুখ করে ঝুলে পড়ল। চারিদিকে মুমূর্ষুর তীক্ষ্ণ একটা আহা আহা শব্দ রহিয়ে রহিয়ে উঠতে লাগল। সব ব্যেপে উঠতে লাগল শুধু একটা বীভৎস কান্নার রব! কান্নায় যেন সারা বিশ্বের বত্রিশ নাড়ি পাক দিয়ে অশ্রু ঝরছিল, ঝম ঝম ঝম।

শুধু তেমনি অচল অটল হয়ে একটা বিরাট পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়েছিলেন মা!'

শুধু তাঁর শেষ সময় বলেছিলেন, 'বাপ রে, আমাকে তো কাঁদতে নেই, তুই তো আর আমার নস, তোকে খোদার কাছে কোরবানি দিয়েছি! খোদার নামে উৎসর্গীকৃত জিনিসে তো আমার অধিকার নেই!—তবে চল বাপ, তুই তো আমায় ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারিসনে, আমিও তোকে কখনো চোখের আড়াল করিনি। তোর কাজ ফুরিয়েছে, আমারও কাজ ফুরাল আজ।'

কতকগুলো লোকের মগজ নাকি এমনি খারাপ হয়ে যায় যে, তারা এক একটা ছোট্ট মুহূর্তকেই একটা অখণ্ড কাল বলে ভাবে। তবে কি আমারও মাথা সেই রকম খারাপ হয়ে গেছে, তা না হলে আমার বোধ হচ্ছে কেন যে, এসব ঘটনা যেন বাবা-আদমের কালে ঘটে গেছে, আর আমি এমনি করে গোরস্থানে বসেই আছি। তুই কিন্তু বলছিস, এই সে দিন তাঁরা মারা গেছেন। তবে তো আমি সত্যিই পাগল হয়ে গেছি!

কি বলছিস, এ গোরস্থানে এলুম কেন?—আহা, কথার ছিরি দেখ! এই গোরস্থানে যেখানে সব সত্যিকার মানুষ শুয়ে রয়েছেন, সেখানে না এসে, যাব কি তবে বন-জঙ্গলে যেখানে এক রকম জন্তু আছে, যাদের শুধু মানুষের মতো হাত পা' আর অন্তরটা শয়তানের চেয়েও কুৎসিত কালো?—আমার বেশ মনে পড়ে, যখন তাঁর লাশ কাঁধে করে বাইরে আনা হলো, তখন ওদের কে একজন আত্মীয় আমার চুল ধরে বললে 'যা শয়তানি, বেরো ঘর থেকে এখনি! তখনি বলেছিলুম, বুনিয়াদি খানদানের উপর নাক চড়ানো, এ সইবে কেন? তোকে ঘরে এনে শেষে বংশে বাতি দিতে পর্যন্ত রইল না কেউ; বেরো রাক্ষুসী, আর গাঁয়ের লোকের সামনে মুখ দেখাস না! আর ইচ্ছা হয় চল, তোর আর একটা নেকা দিয়ে দি!'—অত মার গাল কিছুই বাজে নাই আমার প্রাণে, যত

বেজেছিল ঐ একটা নেকার কথায়। ঐ বিশ্রী কথাটা একটা মস্ত আঘাতের মতো বেজেছিল আমার চূর্ণ বক্ষে।—ওগো নেকা কি? সে কি দুবার অন্যের গলায় মালা দেওয়া? শাস্ত্রে নেকার কথা আছে, সে কাদের জন্যে? আচ্ছা ভাই, যারা বাধ্য হয়ে অন্নবস্ত্রাভাবে বা আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে ওরকম করে ভালবাসার অপমান করে, তাদের কি হৃদয় বলে কোন একটা জিনিস নাই? তা হলেও তাদিগকে ক্ষমা করা যেতে পারে, কিন্তু যারা শুধু কামনার বশবর্তী হয়ে পবিত্রতাকে, নারীত্বকে ওরকম মাড়িয়ে চলে যায়, তাদের কোথাও ক্ষমা নাই। ভালবাসা—স্বর্গের এমন পবিত্র ফুলকে কামনার শ্বাসে যে কলঙ্কিত করে, তাঁর উপযুক্ত বোধ হয় এখনো কোন নরকের সৃষ্টি হয় নাই।

মৌলবী সাহেবরা হয়তো খুব চটে আমার 'জানাজা'র নামাজই পড়বেন না, কিন্তু মানুষ আর মৌলবিতে অনেক তফাৎ—শাস্ত্র আর হৃদয়, অনেকটা তফাৎ।

[চ]

যেখানে শুধু এই রকম অবমাননা, সেখান থেকে সরে এসে এই মরার দেশে থাকাই ভাল।

* * *

ওকি, তুমি এমন করে আঁতকে উঠলে কেন? আমি মূর্ছা গেছলুম বলে?—কি বলছ আমি বিষ খেয়েছি?—তাহলে তুমিও পাগল হয়েছে! আমার চেহারা এমন নীল হয়ে গেছে দেখে তুমি হয়তো মনে করেছ, আমি বিষ খেয়েছি। না গো না, আমি পাগল হই আর যা-ই হই ও-রকম দুর্বলতা আমার মধ্যে নেই। কেরাসিনে পোড়া, জলে ডোবা, গলায় দড়ি দেওয়া, বিষ খাওয়া মেয়েদের জাতটার যেন রোগের মধ্যে দাঁড়িয়েছে! আমার কপাল পুড়লেও আমি ও রকম 'হারামি মওত'কে প্রাণ থেকে ঘৃণা করি। এ মরায় যে এ-দুনিয়া ও আখের উভয়ের খারাবি, বোন!

কাল রাত্রে ভয় পেয়ে যখন তুই আমার কাছ হতে চলে গেলি, তার একটু পর থেকেই আমার ভেদবমি আরম্ভ হয়েছে! এই একটু আগে আমার জ্ঞান হলো।

আমি বুঝতে পেরেছি বোন, আমার আর সময় নাই। আর কারুর চোখের জলের বাধা আমায় বেঁধে রাখতে পারবে না। ওঃ এত দিনে ঐ নদীর পারের অলস-ঘুমে ভরা সুরটা আমার প্রাণে গভীর স্পর্শ করে গেল। সে কত গভীর দুঃখ ভরা! পানি আমার চোখের-কোল ছেয়ে ফেলেছে দিদি! তার কোমল স্পর্শ আমার চোখের পাতায় পাতায় অনুভব করছি। কি শিহরণ আমার প্রতি লোমকূপে খেলে বেড়াচ্ছে!

'কি পিপাসা, কি বুক-ফাটা তৃষ্ণা! একটু পানি দে তো বোন!—না না, আর চাই না। ঐ দেখতে পাচ্ছ 'শরাবান তহুরা'-ভরা পেয়ালা হাতে আমার স্বামী হৃদয়-সর্বস্ব দাঁড়িয়ে রয়েছেন! কি সহানুভূতি-আর্দ্র করুণ স্নেহময় গভীর দৃষ্টি তাঁর! আঃ মা গো! আঃ!

দুরন্ত পথিক

[কথিকা]

সে চলিতেছিল দুর্গম কাঁটা-ভরা পথ দিয়ে। চলিতে চলিতে সে একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল, লক্ষ আঁখি অনিমিখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে-দৃষ্টিতে আশা-উন্মাদনার ভাস্বর জ্যোতি ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। তাহাই ঐ দুরন্ত পথিকের বক্ষ এক মাদকতা-ভরা গৌরবে ভরপুর করিয়া দিল। সে প্রাণ-ভরা তৃপ্তির হাসি হাসিয়া বলিল, 'হাঁ ভাই! তোমাদের এমন শক্তি-ভরা দৃষ্টি পেলে কোথায়?' অযুত আঁখির অযুত দীপ্ত চাউনি বলিয়া উঠিল,—'ওগো সাহসী পথিক, এ দৃষ্টি পেয়েছি তোমারই চলার পথ চেয়ে!' উহারই মধ্যে কাহারো স্নেহ-করুণ চাউনি বাণীতে ফুটিয়া উঠিল,—'হায়! এ দুর্গম পথে তরুণ পথিকের মৃত্যু যে অনিবার্য!' অমনি লক্ষ কণ্ঠের আর্ত ঝঙ্কার গর্জন করিয়া উঠিল, 'চোপরাও ভীরু! এই তো মানবাত্মার সত্য শাশ্বত পথ!' পথিক দুচোখ পুরিয়া এই কল্যাণ-দৃষ্টির শক্তি হরণ করিয়া লইল। তাহার সুপ্ত যত কিছু অন্তরের সত্য, এক অঙ্গুলি-পরশে সাধা বীণার বঞ্চনার মতো সাগ্রহে সাড়া দিয়া উঠিল,—'আগে চলো!' বনের সবুজ তাহার অবুঝ তারুণ্য দিয়া পথিকের প্রাণ ভরিয়া দিয়া বলিল—'এই তোমার যৌবনের রাজটিকা পরিয়ে দিলাম; তুমি চির-যৌবন, চির অমর হলে।' দূরের আকাশ আনত হইয়া তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া গেল। দূরের দিগ্বলয় তাহাকে মুক্তির সীমারেখার আবছায়া দেখাইতে লাগিল। দুই পাশে তাহার বনের শাখী শাখার পতাকা দুলাইয়া তাহাকে অভিনন্দন করিতে লাগিল। স্বাধীন দেশের তোরণ-দ্বার পারাইয়া বোধন-বাঁশির অগ্নি-সুর হরিণের মতো তাহাকে মুগ্ধ মাতাল করিয়া ডাক দিতেছিল। বাঁশির টানে মুক্তির পথ লক্ষ্য করিয়া সে ছুটিতে লাগিল।—'ওগো কোথায় তোমার সিংহদ্বার? দ্বার খোলো, দ্বার খোলো,—আলো দেখাও, পথ দেখাও!' ... বিশ্বের কল্যাণের মন্ত্র তাহাকে ঘিরিয়া বলিল, —'এখনো অনেক দেরি, পথ চলো!' পথিক চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—'ওগো আমি যে তোমাকেই চাই!' সে অচিন সাথী বলিয়া উঠিল,—'আমাকে পেতে হলে ঐ সামনের বুলন্দ-দরওয়াজা পার হতে হয়!' দুরন্ত পথিক তাহার চলার দুর্বার বেগের গতি আনিয়া বলিল—'হ্যাঁ ভাই, তাহাই আমার লক্ষ্য!' দূরের বনের ফাঁকে মুক্ত গগন একবার চমকাইয়া গেল, পেছন হইতে নিযুত তরুণ কণ্ঠের বিপুল বাণী শোর করিয়া বলিয়া উঠিল,—'আমাদেরও লক্ষ্য ঐ, চলো

ভাই, আগে চলো—তোমারই পায়ে-চলা পথ ধরে আমরা চলেছি।' পথিক আগে চলার গৌরবের তৃপ্তি তাহার কণ্ঠে ফুটাইয়া হাঁকিয়া উঠিল, 'এ পথে যে মরণের ভয় আছে!' বিক্ষুব্ধ তরুণ কণ্ঠে প্রদীপ্ত আগুন যেন গর্জ্জিয়া উঠিল,—'কুছ পরওয়া নেই! ও তো মরণ নয়, ও যে জীবনের আরম্ভ!' ... অনেক পিছনে পাঁজর-ভাঙা বৃদ্ধেরা মরণের ভয়ে কাঁপিয়া মরিতেছিল! তাহাদের স্কন্ধদেশে চড়িয়া একজন মুখ-চোখ ভ্যাঙচাইয়া বলিতেছিল,—'এই দেখো মরণ!' একটু দূরে চন্দন-কুণ্ডলী ধোঁওয়া-ভরা আগুন জ্বালাইয়া বৃদ্ধের দৃষ্টি-চাহনি প্রতারিত করার চেষ্টা করা হইতেছিল। হাসি চাপিতে চাপিতে একজন ইহাদিগকে সম্মুখের ধুলায় আগুনের দিকে খেদাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিতেছিল,—'ঐ তো সামনে তোমাদের নির্বাণ কুণ্ড; এ বৃদ্ধ বয়সে কেন বন্ধুর পথে ছুটতে গিয়ে প্রাণ হারাবে? ও দুরন্ত পথিকদল মল বলে!' বৃদ্ধের দল দুই হাত উপরে উঠাইয়া বলিল,—'হ্যাঁ হুজুর, আলবৎ!' তাহার আশেপাশে কাহার দুষ্ট কণ্ঠ বারেবারে সতর্ক করিতেছিল,—'ওহো বেকুবদল, ভিক্ষায়াৎ নৈব নৈব চ! তোদের এরা নির্বাণ-কুণ্ডে পুড়িয়ে তিল তিল করে মারবে!' তাদের রাখাল হাসি চাপিয়া বলিয়া উঠিল,—'না না, ওদের কথা শুনো না। ওদের পথ ভীতি-সঙ্কুল আর অনেক দূর, তাও আবার দুঃখ-কষ্ট-কাঁটা-পাথর-ভরা, তোমাদের মুক্তি ঐ সামনে।'

দুরন্ত পথিক চলিয়াছিল, সেই মুক্ত দেশের উদ্বোধন-বাঁশির সুর ধরিয়া। ... এইবার তাহার পথের বিভীষিকা জুলুম আরম্ভ করিল। পথিক দেখিল, ঐ পথ বাহিয়া যাওয়ায় এক-আধটুকু অস্ফুট পদচিহ্ন এখনো যেন জাগিয়া রহিয়াছে। পথের বিভীষিকা তাহাদেরই মাথার খুলি এই নতুন পথিকের সামনে ধরিয়া বলিল,—'এই দেখো এদের পরিণাম!' সেই খুলি মাথায় করিয়া নতুন পথিক আর্তনাদ করিয়া উঠিল,—'আহা, এরাই তো আমায় ডাক দিয়েছে! আমি এমনই পরিণাম চাই—আমার মৃত্যুতেই তো আমার শেষ নয়, আমার পশ্চাতে ঐ যে তরুণ যাত্রীর দল, ওদের মাঝখানেই আমি বেঁচে থাকব!' বিভীষিকা বললে,—'তুমি কে?' পথিক হেসে বললে,—'আমি চিরন্তন মুক্তিকামী। এই যাদের খুলি পড়ে রয়েছে তারা কেউ মরেনি, আমার মাঝেই তারা নূতন শক্তি, নূতন জীবন, নূতন আলোক নিয়ে এসেছে। এ মুক্তের দল অমর।' বিভীষিকা কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল,—'আমায় চেনো না? আমি শৃঙ্খল। তুমি যাই বলো, তোমাকে হত্যা করাই আমার ব্রত, মুক্তিতে বন্ধন দেওয়াই আমার লক্ষ্য। তোমাকে মরতে হবে!' দুরন্ত পথিক দাঁড়াইয়া বলিল,—'মারো,—বাঁধো,—কিন্তু আমাকে বাঁধতে পারবে না; আমার তো মৃত্যু নাই! আমি আবার আসব!' বিভীষিকা পথ আগুলিয়া বলিল,—'আমার যতক্ষণ শক্তি আছে, ততক্ষণ তুমি যতবারই আসো তোমাকে বধ করব। শক্তি থাকে আমায় মারো, নতুবা আমার মার সহ্য করতে হবে।'

অনেক দূরে মুক্ত দেশের অলিন্দে এই পথেরই বিগত শহীদের চিরতরুণ জ্যোতির্ময় দেহ লইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিল ! পথিক বলিল,—'কিন্তু এই জীবন দেওয়াটাই কি জীবনের সার্থকতা ?' মুক্ত বাতায়ন হইতে মুক্ত আত্মা স্নিগ্ধ-আর্দ্র কণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—'হাঁ ভাই ! যুগ যুগ জীবন তো এই মৃত্যুরই বন্দনাগান গাইছে। সহস্র প্রাণের উদ্বোধনই তো তোমার মরণের সার্থকতা। নিজে মরিয়া জাগানোতেই তোমার মৃত্যু যে চিরজাগ্রত অমর !' নবীন পথিক তাহার তরুণ বিশাল বক্ষ উন্মোচন করিয়া অগ্রে বাড়াইয়া দিয়া কহিল,—'তবে চালাও খঞ্জর !' পিছন হইতে তরুণ যাত্রীর দল দুরন্ত পথিকের প্রাণশূন্য দেহ মাথায় তুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল—'তুমি আবার এসো।' অনেক দূরে দিগ্বলয়ের কোলে কাহাদের একতান-সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল,—

'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি !'